বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

১ এবং ৩৩ কলেজ রো

কলিকাতা

মাকে দিলাম

ভূমিকা

বঙ্কিমচর্চার ক্ষেত্রে এতকাল বঙ্কিমগ্রন্থাবলীই ছিল আমাদের চিন্তা ভাবনা গবেষণা বা রসবিচারের একমাত্র অবলম্বন। বর্তমান গ্রন্থে এ-কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে শুধু প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে যদি সেই সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিই তাহলে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে শতাব্দকাল পরেও বহু নূতনতর উপকরণের সন্ধান পাওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে বঙ্কিমচর্চার পরিধি বিস্তৃততর এবং তাঁর সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গভীরতর হতে পারে।

স্বল্প কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনাই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত। পরে সেই সকল রচনা লেখক কর্তৃক গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত বঙ্কিমের সকল রচনাই কি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে? বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়—তা হয়নি। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বঙ্কিম জানিয়েছিলেন, 'যাহা এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম।' এবং 'অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।' অতঃপর বঙ্কিম যে-স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন তার মধ্যে বিবিধ প্রবন্ধের নূতন কোন সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি।

দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বা মৃণালিনী নয়, বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমেই বঙ্কিম নিজেকে আবিষ্কার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেবল ঔপন্যাসিক রূপে নয়, বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি ঔপন্যাসিক দার্শনিক প্রাবন্ধিক সমাজসংস্কারক সমালোচক সম্পাদক ইত্যাদি বিবিধ মূর্তিতে বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হন।

বঙ্কিমের সংকল্প সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাসটুকুই নয়, সমগ্র বঙ্কিমযুগের ইতিহাসই বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা যায়।

দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই হোক বা আমাদের ঔদাসীন্যের জন্যই হোক, বঙ্কিম-অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর সুমহৎ কীর্তি বঙ্গদর্শনের কথা আমরা অদ্যাবধি

বিশেষভাবে স্মরণ করিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ' করেন। 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতসূর্য' কে? রবীন্দ্রনাথের অভিমত—'বঙ্গদর্শন'।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের একালে বসে একদা পূর্বকালের পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে যে 'প্রভাতসূর্যে'র উদয় হয়েছিল, সেই সূর্যসন্দর্শনের প্রেরণায় বর্তমান গ্রন্থ রচিত হল।

গবেষণাকার্যে লেখককে নানাবিষয়ে উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন আচার্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও মদীয় অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ লাভ করে আমার আলোচনার অপূর্ণতা হ্রাসের সুযোগ পেয়েছি। 'বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর' শীর্ষক অধ্যায়টি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর প্রেরণায় রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন তাঁর কাছেই বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম, একথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনুকূল্যে মূল বঙ্গদর্শনের দুষ্প্রাপ্য ফাইল দীর্ঘকাল ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। গ্রন্থনের চারুতা সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত অরুণকুমার রায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। জিজ্ঞাসার শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড গ্রন্থটি বিশেষ যত্নসহকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বিনীত
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১লা বৈশাখ ১২৭৯। ১ সংখ্যা।

পত্র সূচনা।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির-জ্ঞান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে

[বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর

উপন্যাসের নূতন সংস্করণ প্রকাশকালে পূর্ববর্তী-পাঠ পরিবর্তন পরিবর্জন ও সংশোধন এবং নবীন-পাঠের সংযোজন—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট প্রবণতা। যে কোন সতর্ক লেখকমাত্রেরই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাঠান্তর বিচারের অর্থ, লেখকের আত্মসমালোচনার পরিচয় লাভ করা। কবি নিজেই কবিতার মিলের সংশোধন করছেন, ছন্দ পরিবর্তন করছেন, ঔপন্যাসিক তাঁর আপন অভিরুচি অনুসারে সৃষ্ট-চরিত্র রূপান্তরিত বা কাহিনী পরিবর্তিত করছেন ; নূতন মুদ্রণ প্রকাশের পূর্বে প্রকাশক পাঠক বা সমালোচক বলে দেননি যে—লেখক মহাশয়, এই সকল স্থানে দোষত্রুটি আছে সংশোধন করুন। গবেষক বা সাহিত্য-সমালোচকের কাছে পুরাতন সংস্করণের যে-মূল্যই থাকুক, সাধারণ সাহিত্য-পাঠকের আগ্রহ সর্বদাই নূতন সংস্করণটির প্রতি। পুরাতন সংস্করণ তাঁর কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। ফলে একজন কবি বা ঔপন্যাসিক প্রথম দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সংস্করণের কোথায় কি কি সংশোধন ও সংযোজন করলেন—তার হিসাব রাখবার অবকাশ ও কৌতূহল সাধারণ পাঠকের নেই। তাই বলছি, ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই লেখক আপন তাগিদেই নিজের লেখা সংশোধন করেন ; এবং এই সংশোধনের অর্থই হল রচনার উন্নতি সাধনের চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে লেখকই তাঁর আপন রচনার পরীক্ষক বা সমালোচক। পাঠান্তর আলোচনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে লেখক ও সমালোচক—একই ব্যক্তিত্বের এই উভয় সত্তার পরিচয় লাভ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসই তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] অতঃপর গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক নানাবিধ সংশোধন-কর্ম সম্পাদন করেন এবং মূল রচনার অধিকতর উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন।

১. বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রকাশকাল এখানে প্রদত্ত হল। বিষবৃক্ষ ১২৭৯ বৈশাখ—ফাল্গুন, ইন্দিরা ১২৭৯ চৈত্র, যুগলাঙ্গুরীয় ১২৮০ বৈশাখ, চন্দ্রশেখর ১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র, রজনী ১২৮১ আশ্বিন—১২৮২ অগ্রহায়ণ, রাধারাণী ১২৮২ অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণকান্তের উইল ১২৮২ পৌষ—চৈত্র এবং ১২৮৪ বৈশাখ—মাঘ, রাজসিংহ ১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র, আনন্দমঠ ১২৮৭ চৈত্র—১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ, দেবী চৌধুরাণী (অংশতঃ প্রকাশিত) ১২৮৯ পৌষ—চৈত্র।

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১] লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই সকল সংস্করণেও লেখকের অজস্র পরিবর্তন পরিমার্জন ও সংযোজন-কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন।

ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে।...ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে।" ইন্দিরার পূর্ববর্তী কোন উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা বা 'বিজ্ঞাপন' পাই না। চন্দ্রশেখর উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।" রাধারাণীর চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে, "এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে।" কৃষ্ণকান্তের উইল গ্রন্থে কোন ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন নেই। রজনীর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।" রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণে বা পুনঃপ্রণীত রাজসিংহের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমের উক্তি, "হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।...যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব পূর্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের

১. দুর্গেশনন্দিনী ১৩, কপালকুণ্ডলা ৮, মৃণালিনী ১০, বিষবৃক্ষ ৮, ইন্দিরা ৫, যুগলাঙ্গুরীয় ৫, চন্দ্রশেখর ৩, রজনী ৩, রাধারাণী ৪, কৃষ্ণকান্তের উইল ৪, রাজসিংহ ৪, আনন্দমঠ ৫, দেবী চৌধুরাণী ৬ এবং সীতারামের ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপন্যাসের উপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে, "এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল। আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwards নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।" পঞ্চম সংস্করণের বক্তব্য, "তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল।" দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের কিয়দংশ প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে সম্পূর্ণ অংশ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বঙ্গদর্শন ও গ্রন্থের পাঠের মধ্যে কিছু কিছু বিভেদ রয়েছে। দেবী চৌধুরাণীর প্রথম সংস্করণের যে বিজ্ঞাপন পাচ্ছি তাতে পাঠপরিবর্তন সম্বন্ধে লেখক কোন মন্তব্য করেন নি। দেবী চৌধুরাণীর পরবর্তী সংস্করণসমূহেরও কোন বিজ্ঞাপন পাই না। বঙ্কিমের জীবিতকালে সীতারামের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখক জানিয়েছেন, "সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে স্বীয় রচনার পাঠপরিবর্তনে তাঁর কিরূপ প্রবণতা ও সচেতনতা ছিল তা সন্ধান করা যেতে পারে। বঙ্গদর্শন পত্রিকার পাঠ এবং গ্রন্থের প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠ অবলম্বনে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের[১] নবকুমারের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সে পরোপকারী, সাহসী ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ। উপন্যাসের এই নবকুমারকে শক্তিশালী কাপালিক বধ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু নূতন সংস্করণ প্রকাশের সময় ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মতম রচনা সংশোধনের ফলে সেই নবকুমার মৃত্যুর অন্ধকার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা এখন কি বিবরণ পাই? বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা :

"নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ। —গৃহে চল।'

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃণ্ময়ি! —না!—' এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীর-ভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।"

কপালকুণ্ডলা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কিন্তু ঠিক এ কাহিনী ছিল না। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নবকুমারের জীবিতাবস্থাতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটি এই :

"কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত

১. কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্য-স্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল—মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃণ্ময়ী কোথায়? নবকুমার উত্তর করিলেন, মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি!"

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে যে কাহিনী রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে তার রূপান্তরসাধন করেছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার প্রথম সংস্করণের একস্থানে বলেছিলেন, "কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, 'এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।' ইহার উত্তর, 'অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।' এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই।" প্রথম সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হল, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে যে পরিণতি ঘটেছে তা পাঠকের পরিতৃপ্তিবিধায়ক না হলেও অনিবার্য। কারণ তা অদৃষ্টের নির্দেশ, তাকে খণ্ডিত করবার মত সাধ্য মূল ঔপন্যাসিকেরও নেই। এই অদৃষ্ট যে কিরূপ দুর্নিবার ও কতখানি সর্বজনস্বীকৃত তা প্রমাণ করবার জন্য বলেছেন, "সর্বদেশে সর্বকালে দূরদর্শিগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট যুনানী নাটকাবলির প্রাণ; সর্বজ্ঞ সেক্‌স্‌পীয়রের মাক্‌বেথের আধার; ওয়ালটর স্কটের 'ব্রাইড্ অব লেমার মুরে' ইহার ছায়াপাত হইয়াছে।" এত ব্যাখ্যা ও ঘোষণা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কপালকুণ্ডলা কাহিনীর পরিবর্তন করলেন। কাহিনী যখন শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন করতেই হল তখন

অদৃষ্টতত্ত্বের বিশ্লেষণ গ্রন্থমধ্যে নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। তাই কাহিনী পরিবর্তনের সঙ্গে অদৃষ্টতত্ত্বালোচনাও গ্রন্থ থেকে পরিত্যক্ত হল।

এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে কেন কাহিনী পরিবর্তন করলেন? কাপালিক কর্তৃক জল থেকে উদ্ধারের পর যে অচৈতন্য নবকুমারের পুনরায় চেতনা ফিরে এসেছিল, সেই নবকুমারকে পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বায়ু-বিক্ষিপ্ত গঙ্গাপ্রবাহের মধ্য থেকে কেন উদ্ধার করে আনলেন না? কাপালিকই বা এবার উদ্ধারকার্যে এগিয়ে এল না কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মূল কাহিনী কেন পরিবর্তিত করলেন, এর কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম কাহিনীতে ছিল কাপালিক জলের মধ্যে নবকুমারকে দেখতে পেয়ে 'লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন'। কিন্তু সত্যিই কি কাপালিকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভবপর ছিল? কারণ বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসের মধ্যে পাঠককে এক স্থানে সম্বোধন করে বলেছেন, "পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল।" আর কাপালিকের নিজের উক্তি, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।" যে বাহু কাষ্ঠাহরণে অক্ষম সে বাহুর পক্ষে গঙ্গায় নিমজ্জিত কোন মনুষ্যকে 'অনায়াসে' কূলে তুলে আনা কি প্রকারে সম্ভব? এই অসঙ্গতির দিকটি হয়তো তৎকালের কোন পাঠক লেখকের নজরে আনে কিংবা এই ত্রুটিটি বঙ্কিম নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় তা সংশোধন করে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার কাহিনী কেন পরিবর্তন করলেন সে বিষয়ে আরও একটি গুরুতর কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর আট বৎসর পরে ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃণ্ময়ী' নামে কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ রচনা করেন। অর্থাৎ

কপালকুণ্ডলার পূর্বের কাহিনী যেখানে শেষ—নবকুমারের উদ্ধার ও চেতনা লাভের মধ্যে ; মৃণ্ময়ী উপন্যাসের সূত্রপাত সেখান থেকেই। আজ থেকে এক শত বৎসর পূর্বের বাঙালী পাঠক সেদিনের সত্তপ্রকাশিত কপালকুণ্ডলা পাঠ করে অনুভব করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র অনতিবিলম্বে এ উপন্যাসের একখানি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবেন। কারণ, নবকুমারের পত্নী কপালকুণ্ডলা গঙ্গাপ্রবাহে নিজেকে বিসর্জন দিলেও, জীবিত অবস্থায় উপন্যাস-মঞ্চে দুটি প্রধান চরিত্র নবকুমার ও তার পূর্ব-পত্নী পদ্মাবতী বর্তমান। সুতরাং এদের জীবনের পরিণতি কি ? গল্পের শেষ কোথায় ?

১৮৬৬ থেকে ১৮৭৪—অর্থাৎ আট বছর কেটে গেল, এর মধ্যে উপন্যাসের তিনটি মুদ্রণ প্রকাশিত হল, কিন্তু নবকুমার-পদ্মাবতী জীবনের নতুন কি ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর জানালেন না। সেই সুযোগ নিয়ে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ চরিতার্থ করলেন দামোদর ১৮৭৪এ মৃণ্ময়ী উপন্যাস রচনা করে। এর পর এক সময় এমন দাঁড়াল যে, সেকালের পাঠকের কাছে কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা মৃণ্ময়ী উপন্যাসের কাহিনী বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৭৪, বঙ্কিম সে সময় শুধু দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলার রচয়িতা নন, এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে ; কিন্তু মৃণ্ময়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কপালকুণ্ডলা কিছুটা নিষ্প্রভ, জনপ্রিয়তায় মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে চিন্তা করতে হল ; এবং তার পরেই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পরিণতির এক আশ্চর্য নাটকীয় পরিবর্তন। নবকুমার ও কপাল-কুণ্ডলা—উভয়েই অনন্ত গঙ্গার চৈত্রবায়ুবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হল, তাদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার কূলে আশঙ্কিত কাপালিকের আর আবির্ভাব ঘটল না। এরপর মৃত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কাহিনী নিয়ে দামোদরের মৃণ্ময়ী সাহিত্যের বাজারে আর তেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারল না।

ইন্দিরা উপন্যাসের 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে।··· তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ

করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্তু অনেক ছোট লোকেই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে? পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে।"

এই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান্তর বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। এবং তাঁর পাঠকবর্গের প্রতিই ভাল মন্দ বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। বঙ্কিমের নির্দেশ অনুসারেই আমরা এখানে ইন্দিরার প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণ (জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণ)-এর তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ইন্দিরা ও প্রথম সংস্করণের ইন্দিরার মধ্যে পাঠবিভেদ নেই। ইন্দিরার প্রথম সংস্করণে বঙ্গদর্শনের পাঠই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ইন্দিরার প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫। পঞ্চম সংস্করণ বর্ধিত হয়ে ১৭৭ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়।

ইন্দিরার প্রথম সংস্করণ আটটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ সংখ্যা-দ্বারা চিহ্নিত, কোন নাম ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চম সংস্করণের প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে এবং তার সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ—আমি শ্বশুরবাড়ি যাইব, দ্বিতীয়—শ্বশুরবাড়ি চলিলাম, তৃতীয়—শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ, চতুর্থ—এখন যাই কোথায়, পঞ্চম—বাজিয়ে যাব মল, ষষ্ঠ—সুবো, সপ্তম—কালির বোতল, অষ্টম—বিবি পাণ্ডব, নবম—পাকা চুলের সুখ-দুঃখ, দশম—আশার প্রদীপ, একাদশ—একটা চোরা চাহনি, দ্বাদশ—হারাণীর হাসি বন্ধ, ত্রয়োদশ—আমাকে একজামিন দিতে হইল, চতুর্দশ—আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা, পঞ্চদশ—কুলের বাহির, ষোড়শ—খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম, সপ্তদশ—ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক, অষ্টাদশ—ভারী জুয়াচুরির বন্দোবস্ত, ঊনবিংশ—বিদ্যাধরী, বিংশ—বিদ্যাধরীর অন্তর্ধান,

একবিংশ—সেখানে যেমন ছিল। প্রথম সংস্করণের শেষ কথা 'সমাপ্ত', পঞ্চম সংস্করণের শেষ কথা 'সম্পূর্ণ'।

পঞ্চম সংস্করণে একটি উপকাহিনীর দ্বারা মূল আখ্যানটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গৃহিণী, সুভাষিণী, রমণবাবু, তাদের তিন বছরের ছেলে ও পাঁচ বছরের মেয়ে, ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী ইত্যাদি চরিত্র উপকাহিনীর অন্তর্গত, প্রথম সংস্করণে নেই।

প্রথম সংস্করণের নিম্নোক্ত অংশটিকে উপকাহিনীতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

"কৃষ্ণদাসবাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, 'তুমি আমার কথা শুন। রামরাম দত্ত নামে আমার একজন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্য তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, 'মহাশয়, আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্র-লোকের মেয়ে পরের বাড়ি রাঁধিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন?' আমি বলিয়াছি, 'চেষ্টা দেখিব।' তুমি এ-কার্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমত শক্তি নাই যে, তোমায় আবার খরচপত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।'

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রিদিন 'রূপ! রূপ!' শুনিয়া কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষ জাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামরামবাবুর বয়স কত।'

উ। 'তিনি আমার মত প্রাচীন।'

'তাঁহার স্ত্রী বর্তমান কি না?'

উ। 'দুইটি।'

'অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়িতে কে থাকে?'

উ। 'তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।'

আমি সম্মত হইলাম। পরদিন কৃষ্ণদাসবাবু আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ি পাচিকা হইয়া রহিলাম।"

পঞ্চম সংস্করণের উপকাহিনীতে আছে, সুভাষিণী কৃষ্ণদাসবাবুর স্ত্রীর কাছে বেড়াতে এসেছিল, সব কথা শুনে সে ইন্দিরাকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। শাশুড়ি তাকে পরে পাচিকা হিসাবে রাখতে সম্মত হল।

প্রথম সংস্করণে রামরাম দত্তের বাড়িতে উপেন্দ্রর আগমন কোন পূর্ব-পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। উপেন্দ্র মহাজন হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে রাম দত্তর বাড়িতে এসেছিল মাত্র এবং সেইখানেই আকস্মিকভাবে উপেন্দ্র-ইন্দিরার সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাপরম্পরাহীন নায়ক-নায়িকার এরূপ আকস্মিক মিলন পাঠক-মন সহজে সমর্থন করে নিতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত তা বুঝেছিলেন। পঞ্চম সংস্করণে তিনি উপন্যাসের এই চরিত্র দুটির মিলন-ভার দৈবের হাতে সমর্পণ না করে বুদ্ধিমতী সুভাষিণীর উপর ন্যস্ত করলেন। পূর্ববর্তী চারটি সংস্করণে দৈব প্রাধান্যলাভ করেছিল, পঞ্চম সংস্করণে মানুষ বিজয়ী হল। এই সংস্করণে রামরামবাবুর বাড়িতে উপেন্দ্রর আগমন দৈবাৎ বা আকস্মিক নয়—তার আবির্ভাব সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রের আবর্তনের ফল। সুভাষিণী ও ইন্দিরার কথোপ-কথনের মধ্যে তার পরিচয় আছে।

"হাসিয়া আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন চিনিয়াছ ত?'

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, 'সেকি? তুমি কেমন করে জানলে?' সুভাষিণী মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'আহাঃ, তোমার সোনার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছে? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধরে এনে দিয়েছি!'

আমি বলিলাম, 'তোমরা কে? তুমি আর র-বাবু?'

সুভা। না ত আবার কে? তুমি, তোমার স্বামী শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে, মনে আছে? তাই শুনিয়াই র-বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তারই ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তারপর নিমন্ত্রণ।"

প্রথম সংস্করণের তৃতীয় পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত অংশটি পঞ্চম সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।

"আমার নারী জন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতামণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, 'পাপিষ্ঠে, এ যে অনুরাগ।' আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময় একবার মাত্র স্বামি-সন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

আমি স্বীকার করিতেছি যে একথা বলিয়া আমি দোষশূন্য হইতে পারিতেছি না। সকারণে হউক আর নিষ্কারণেই হউক, পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।"

উপরিউক্ত অংশটি পঞ্চম সংস্করণে অকারণে বর্জিত হয় নি, উপন্যাসের উপকাহিনীটিকে পল্লবিত করে তুলতে এই পরিবর্জনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। 'আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল'—এই কথাগুলিই লক্ষ্য করা যেতে পারে। উপকাহিনী অংশে, সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবুর হাসিতে ইন্দিরা যদি বিষ দেখতে পেত তা হলে কাহিনী কখনই গড়ে ওঠার সুযোগ পেত না। এই রমণবাবু ইন্দিরাকে সর্বদাই সহায়তা করেছে এবং ইন্দিরা-উপেন্দ্রর মিলন-সেতু আপনিই রচনা করেছে। পঞ্চম সংস্করণে সকল মানুষের হাসিতেই বিষ ছিল না—সেখানে পবিত্র মানুষও দুটি-চারটি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সুযোগ পেলেই উপন্যাসের মধ্যেও কিছু তত্ত্বকথা শোনাতে ভালবাসতেন। এই শ্রেণীর তত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠকের অপরিচয় নেই। ইন্দিরার প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পকে নিটোল এবং অত্যন্ত সংহত করে বুনেছিলেন। তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পাঠককে দু-চার কথা শোনাতে তিনি চান নি। কিন্তু পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম ইন্দিরার মুখ দিয়ে বললেন, "পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি চাহনির তত্ত্বটা বুঝাইব।"—ষোড়শ পরিচ্ছেদ। পঞ্চম সংস্করণে ইন্দিরার উক্তির ভেতর থেকে কখনও কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বেরিয়ে এসেছে। এখানে স্পষ্টতই ইন্দিরা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত। কিন্তু প্রথম সংস্করণের ইন্দিরা-চরিত্রের সঙ্গে বক্তা-ইন্দিরার কোন রকম বৈষম্য ঘটে নি।

প্রথম সংস্করণের কাহিনী পঞ্চম সংস্করণের বিংশ পরিচ্ছেদেই শেষ হয়েছে,

কিন্তু গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে আরও দুটি পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়ে। একবিংশ পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেই সম্ভবত ভাল হত, বিদ্যাধরী কাহিনীরও আবশ্যকতা ছিল না। প্রথম সংস্করণে বিদ্যাধরী কাহিনী নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ইন্দিরা প্রসঙ্গে বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে নিজেকে স্বামীর উপর বিদ্যাধরী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও সংশয় ছিল। তিনি এর শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছেন :

"এ-পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে ; কেননা, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায়, এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাঁহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোখ কান ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করিয়া, তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।"

এ উক্তি কার, পাঠকের কাছে কার এই জবাবদিহি? সৃষ্ট ইন্দিরা না স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ?

প্রথম সংস্করণে ইন্দিরা নিজেই দেশে ফেরবার সঙ্কল্প করেছিল :

"কিছুদিন আমরা কলিকাতায় সুখে স্বচ্ছন্দে রহিলাম। আমি এ পর্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একেবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব।··· আমি স্বামীকে বলিলাম, 'আমি একবার কালাদীঘি যাইয়া পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।' স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।" —অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম সংস্করণে লেখক ঘটনা পরিবর্তিত করলেন। ইন্দিরা বাড়ি ফেরার প্রস্তাবই তোলে নি—দেশ থেকে উপেন্দ্ররই ডাক এল :

"আমরা কলিকাতায় দিনকত সুখে স্বচ্ছন্দে রহিলাম। তারপর দেখিলাম, স্বামী একদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে রহিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বিমর্ষ কেন?' তিনি বলিলেন, 'বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে। বাড়ি যাইতে হইবে।"—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ধিত কাহিনীর পক্ষে উপেন্দ্রর দিক থেকে বাড়ি ফেরবার প্রস্তাব সঙ্গত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে উপেন্দ্র কলকাতা থেকে ইন্দিরাকে কালাদীঘিতে পৌছিয়ে দিয়ে সে তার স্বগৃহ মনোহরপুরে চলে গেল। কথা রইল, উপেন্দ্র পাঁচ দিন পর ইন্দিরাকে কালাদীঘি থেকে নিয়ে যাবে। উপেন্দ্র স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করলে ইন্দিরা তার শিবিকাবাহকদের বলল, "আমি আগে মহেশপুর যাইব—তাহার পর কালাদীঘি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" ইন্দিরা বাড়িতে ফিরে এলে পিতামাতার চিনতে এতটুকু বিলম্ব হল না এবং সমস্ত ঘর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে প্লাবিত হয়ে উঠল। পরদিন উপেন্দ্রকে উইলের কাজে পরামর্শের জন্য খবর পাঠিয়ে মহেশপুরে ডাকিয়ে আনা হয়। সেইখানে ইন্দিরা উপেন্দ্রর কাছে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে। কাহিনীর এই শেষাংশের সঙ্গে পঞ্চম সংস্করণের পরিণতিটি মিলিয়ে পরিবর্তন কতখানি ঘটেছে তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তবে এ কথা সত্য যে, প্রথম সংস্করণের সংযত ইন্দিরা কলকাতায় তার স্বামীর কাছে নিজের এমন কোন পরিচয় ব্যক্ত করে নি, যা শুনে উপেন্দ্রর মুখ থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে।"—উনবিংশ পরিচ্ছদ, পঞ্চম সংস্করণ।

প্রথম সংস্করণের ইন্দিরাকে পঞ্চম সংস্করণের তুলনায় নানা কারণে উচ্চাসনের অধিকারী বলে মনে হয়।

কপালকুণ্ডলায় যেমন নবকুমারের আকস্মিক মৃত্যু, কৃষ্ণকান্তের উইলের নতুন সংস্করণে নায়ক গোবিন্দলালের মৃত্যুর কবল থেকে তেমনি আকস্মিক পুনর্জন্ম-প্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম সংস্করণে বা বঙ্গদর্শনে গল্পের শেষ অংশে ছিল :

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনরূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।”

কিন্তু পরে যখন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন গোবিন্দলালকে পুনরায় জীবিত করে তুললেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের যে কাহিনীর সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত সেই অংশ :

“গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।...

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।”

এরই বার বৎসর পরে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসীরূপে গোবিন্দলাল ক্ষণকালের জন্য একবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরে এসেছিল, তারপর আর কোনদিন তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথমে প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। উপন্যাসের প্রথম কিস্তি ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫ ভাদ্র)। বঙ্কিমের জীবিতকালে এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। চতুর্থ বা জীবিতকালের শেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী চরিত্র পরবর্তীকালে পুস্তক-প্রকাশের সময় পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের একটা ক্রমোন্নতি ধরা পড়ে। বঙ্গদর্শনে রোহিণী ছিল সম্পূর্ণ দুশ্চরিত্রা। প্রথম সংস্করণের রোহিণীও প্রায় তাই, দুশ্চরিত্রতা ও লোভ কিছুটা কম দেখান হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বলেছেন, “দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে ; চরিত্রে সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্যন্ত রোহিণী তাহাই আছে।”

বহু আলোচিত বহু বিতর্কিত এই রোহিণীর বয়স কত? কোথাও কি তার বয়সের উল্লেখ আছে? প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে, "সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল।" নবম পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের রূপে মুগ্ধ রোহিণী সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, "কেন যে এত কালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন?"—উদ্ধৃত অংশের অন্তর্গত 'এত কালের পর' কথাটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতকাল বলতে মোটামুটিভাবে কতকাল বুঝতে হবে? বঙ্গদর্শনের পাঠে রোহিণীর বয়সের উল্লেখ ছিল, কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের পর কোন সংস্করণেই রোহিণীর বয়স উল্লিখিত হয় নি। বঙ্গদর্শনে ছিল, "রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহাকে যুবতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতিবৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র দেখাইত।" উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর বয়স উল্লেখ করা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ প্রবণতা। কিন্তু এখানে লেখক রোহিণীর বয়স অনুল্লেখিত রাখলেন কেন?

আরও প্রশ্ন, রোহিণী পূর্বে লোভী ও দুশ্চরিত্রা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তাকে আর সেরূপ দুশ্চরিত্রারূপে অঙ্কিত করা হল না কেন? প্রচলিত, অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণে রোহিণী হরলালের কাছে শেষ পর্যন্ত উইল চুরি করতে সম্মত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তা কোনসময়েই অর্থের প্রত্যাশা বা লোভে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা:

"হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, 'এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।' রোহিণী নোট লইল না। বলিল, 'টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।" কিন্তু এই রোহিণীর মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে কি কথা বলিয়েছিলেন লক্ষ্য করা যাক:

"দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?'

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কি জন্য আসিয়াছিলাম?'

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, 'সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

রোহিণীর এই লোলুপতার চিত্র পরবর্তীকালে বর্জিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ছিল, "রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথাবার্তা কহিয়াছিল।" প্রথম সংস্করণে রোহিণী সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, "রোহিণী বড় মুখরা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটি অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না।" চতুর্থ সংস্করণের কোথাও রোহিণীকে চোর লোভী ব্যাপিকা ইত্যাদি বিশেষণে কলঙ্কিত করা হয় নি। এই পরিবর্তনের কারণ কি রোহিণী চরিত্রটির প্রতি স্রষ্টার মমত্ব বা অনুকম্পা? বস্তুত তা নয়। কৃষ্ণকান্তের উইলের কোথাও রোহিণী চরিত্রের প্রতি লেখকের এতটুকু সহানুভূতি প্রকাশ পায় নি। সুযোগ পেলেই চতুর্থ সংস্করণেরও যেখানে সেখানে তিনি রোহিণীকে 'রাক্ষসী' 'পিশাচী' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন। এই চতুর্থ সংস্করণে যতই বলা হোক--'রোহিণী লোক ভাল নয়' 'রোহিণীর অনেক দোষ', তথাপি এখানে সে চোর বা ব্যাপিকা নয়। রচনার পরিবর্তনে যে চরিত্রটি বঙ্কিম-চন্দ্রকে বেশি ভাবিয়েছে—সে রোহিণী নয়, গোবিন্দলাল। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে গোবিন্দলালের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এক প্রচ্ছন্ন গভীর সহানুভূতির ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে। রোহিণীর স্বার্থে নয়, গোবিন্দলালের স্বার্থেই রোহিণীকে পরিবর্তিত করতে হয়েছে। যে চোর যে ব্যাপিকা যার সঙ্গে কোনও ভদ্রলোকে পর্যন্ত কখনো কথা বলে না, তার রূপে মুগ্ধ হওয়া তার প্রণয়ে আসক্ত হওয়া গোবিন্দলালের চরিত্রের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে আনে। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে তাই উপন্যাসটি একটু অন্যভাবে সাজালেন। এখানে পরোপকারী গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভগিনী-রূপ কল্পনা করে তার দুঃখ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, তাকে ব্যাপিকা বা চোর জেনে নয়।

পূর্বে বলেছি, বঙ্গদর্শনের পাতায় রোহিণীর বয়সের উল্লেখ ছিল। বলা

হয়েছিল রোহিণীর বয়স অষ্টবিংশতিবৎসর। যে রোহিণী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল এবং এখন যার বয়স আঠাশ বৎসর সে হঠাৎ কি-এমন কারণে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তা হল? পরবর্তীকালের সংস্করণে রোহিণীকে দুশ্চরিত্রা বলা হয়নি কোথাও। অল্প বয়সে বিধবা বলতে যদি মনে করা যায় চৌদ্দ বৎসর তবে সে তার বৈধব্যের পর আরো চতুর্দশ বৎসর নিষ্কলঙ্ক চরিত্ররূপে অতিবাহিত করেছে বুঝতে হবে। যার চৌদ্দ বৎসরের বৈধব্য জীবনে কোন পাপ বা কলঙ্ক নেই তাকে হঠাৎ গোবিন্দলালের রূপমুগ্ধ ও প্রণয়াসক্ত হিসাবে কলঙ্কিত করা অস্বাভাবিক। পাঠকের কাছে কখনই তা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন। চতুর্থ সংস্করণে রোহিণীর বয়সের উল্লেখ পাওয়া যাবে না। তাই রূপবর্ণনা পাঠ করে কোন পাঠক তাকে অষ্টাদশী ভাবতে পারেন কেউ বা তাকে বিংশতিবর্ষীয়া রূপেও কল্পনা করতে পারেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি বঙ্গদর্শনে ও কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলালের মৃত্যুতে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছিল, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে মৃত্যুতে নয়, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি। এই পরিবর্তনের কারণ সন্ধান করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন বঙ্কিম মৃত্যুকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন মৃত্যু মানুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং মৃত্যু একপ্রকার মুক্তি একপ্রকার শান্তি। ভ্রমর মরণের মধ্য দিয়ে সেই শান্তি লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষে বলেছেন, "ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।" বঙ্গদর্শনে ও প্রথম সংস্করণে মৃত্যু গোবিন্দলালের সহায় হয়েছিল, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে গোবিন্দলাল সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। গোবিন্দলাল রূপমোহে মুগ্ধ হয়েছিল, ভ্রমরকে ত্যাগ করে সে রোহিণীকে গ্রহণ করেছিল—এ তার চরিত্রের পাপের পরিচয় বহন করছে। 'সে দুষ্কৃতকারী'। সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে এক চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।" গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে অনেক পাপ সঞ্চয় করেছে সুতরাং তার শাস্তিবিধান কর্তব্য।

তাই পূর্ব-সংস্করণের পাঠ পরিবর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ পুস্তকাকারে প্রথমে 'ক্ষুদ্র কথা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছয় সংখ্যা ধরে রচনাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, কিন্তু গ্রন্থটি তখন সম্পূর্ণ হয় নি। উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশটুকুই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে পুস্তকাকারে 'ক্ষুদ্রকথা' নামে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি যে সত্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে নি—এই 'ক্ষুদ্র কথা' বিশেষণটির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, "রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে অল্প পরিবর্তন করিয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। এক্ষণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। এ অবস্থায় গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করাতে অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন। একবার মনে করিয়াছিলাম, এই বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ উপায় আছে। তাঁহারা গ্রন্থখানি না পড়িলেই হইল।" যাই হোক, বঙ্গদর্শনে রাজসিংহের উনিশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু পরিবর্তন করে এই উনিশ পরিচ্ছেদেই রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল। রাজসিংহ কেন বঙ্গদর্শনে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল? ১৩০১এর সাধনা পত্রিকায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম।...রাজসিংহ তাহার কিছুদিন আগে বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁর কোন বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, 'এঁরা বলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।'...চন্দ্রশেখর বাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত ২।১টা ডাকাতের

চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ বাহির হইল।" বঙ্গদর্শনে প্রকাশের তিন বৎসর পর ১২৮৮ বঙ্গাব্দে রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজসিংহ বা রাজসিংহের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ—যে কোন গ্রন্থই ; বঙ্কিম-পরিকল্পিত সমগ্র রাজসিংহ উপাখ্যানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপাখ্যান সম্পূর্ণতা লাভ করে। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের বছরই ১৮৯৪এ বঙ্কিমের মৃত্যু ঘটে। ফলে সম্পূর্ণ রাজসিংহ উপন্যাসের কোন সংস্কারের সুযোগ তিনি আর পান নি।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণের শুদ্ধি অশুদ্ধি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই সচেতন ছিলেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক 'সহজ রচনাশিক্ষা'য় তিনি ব্যাকরণ অংশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশি। এ বইটি যাঁরা পাঠ করেছেন—এ কথা তাঁদের অজানা নয়। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিম এরূপ ব্যবহার অপ্রযোজ্য বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন :

"ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষা সমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্বে সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' 'রাজকুমারি' 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্যে' এবং 'সসৈন্য' দুই-ই লিখিয়াছি—একটু অর্থ প্রভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত' এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি।".

রাজসিংহের প্রথম সংস্করণে সম্বোধনে 'রাজকুমারি' ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্মল চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করেছে—'রাজকুমারি—যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?'

চতুর্থ সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে নির্মল চঞ্চলকে এই একই কথা জিজ্ঞাসা করেছে—'রাজকুমারি! যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?'

বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় ঘোষণা করলেন, "আমি যদিও ইতিপূর্বে সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' 'রাজকুমারি' 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।' তথাপি আমরা দেখছি চতুর্থ সংস্করণের সর্বত্রই সম্বোধনে 'রাজকুমারি' ব্যবহৃত হয়েছে। এই বৈষম্যের কারণ কোথায় তা অনুসন্ধান করবার বিষয়। ইন্দিরা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সম্বোধনে 'কামিনি' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'হাঁ দেখ্, কামিনি তুই আরও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস?'—অষ্টম পরিচ্ছেদ। কিন্তু পঞ্চম সংস্করণে 'কামিনি' পরিবর্তিত হয়ে 'কামিনী' হয়েছে। যেমন 'উ-বাবু বলিলেন, কামিনী, তুই নাচবি?' —একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণ এবং রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইন্দিরায় সম্বোধনে 'কামিনী' হল অথচ রাজসিংহে 'রাজকুমারি' বানানই রয়ে গেল। এই প্রমাদের জন্য বঙ্কিমকে দায়ী করা নিশ্চয় সঙ্গত হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে নানাবিধ সংশোধন ও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেই পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চম সংস্করণের বরেন্দ্রভূম বঙ্গদর্শনের পাঠে ও প্রথম চার সংস্করণে বীরভূম ছিল। বীরভূম, অজয়ের তীরবর্তী কোনও আরণ্য এবং পার্বত্য প্রদেশ ছিল আনন্দমঠের ঘটনাস্থল। কিন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আসলে সংঘটিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখ করেন। কিন্তু বলেন, "[illegible] আমি [illegible]রাত্মক বিবেচনা করি না—কেননা, উপন্যাস উপ[illegible], ইতিহাস নহে।" [illegible]তরাং উক্ত সংস্করণে এ ক্ষেত্রে ইতিহাস ও উপন্যাসে ঐক্য সংস্থাপিত হল না।

চতুর্থ সংস্করণেও নয়। কিন্তু পঞ্চম সংস্করণে বীরভূম বরেন্দ্রভূমে পরিবর্তিত হল। পরিবর্তন কিভাবে হয়েছে তার দু একটি উদাহরণ দিই। বঙ্গদর্শন ও প্রথম সংস্করণে ভবানন্দের উক্তি, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বীরভূমে নাই।" এই স্থলে পঞ্চম সংস্করণে আছে, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই।"—প্রথম খণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রথম সংস্করণে জ্ঞানানন্দের উক্তি, "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া অজয়ের জলে ফেলিয়া দিব।...চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া অজয়ের জলে ফেলিয়া দিই।" পঞ্চম সংস্করণে 'অজয়ের জল' 'নদীর জলে' পরিণত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত। বঙ্গদর্শনের পাঠে বা প্রথম সংস্করণের একস্থানে আছে, "সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল। এইরূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সন্তান নাম কীর্তিত করিতে লাগিল।" পঞ্চম সংস্করণে বীরভূমকে পরিত্যাগ করতে গিয়ে বঙ্কিম শেষ ছত্রটি সম্পূর্ণ বর্জন করলেন।—তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। প্রথম সংস্করণে বা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছিল, "মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার [মেজর এড্‌ওয়ার্ড্‌স্] শিবিরের অদূরবর্তী কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা।" এই স্থলে পঞ্চম সংস্করণে হয়েছে, "তাঁহার শিবিরের অদূরবর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে।"—চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র বীরভূমকে বরেন্দ্রভূমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন সত্য, কিন্তু সমগ্র কাহিনীতে বীরভূমের অরণ্য নদী ও পর্বত এমনভাবে মিশে ছিল যে সামান্য কয়েকটি নাম পরিত্যাগ করে বা নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল বীরভূমে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হননি।

বঙ্গদর্শনের বা প্রথম চার সংস্করণের মেজর উড্ পঞ্চম সংস্করণে ইতিহাসের সত্য রক্ষার দাবিতে মেজর এড্‌ওয়ার্ডস্ নাম গ্রহণ করেছে।

পঞ্চম সংস্করণের শান্তি চরিত্র বিশেষ লক্ষণীয়। এই সংস্করণে বঙ্কিমের উক্তি, "শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা

অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল।"

এখন প্রশ্ন, শান্তি কি ছিল এবং কি হয়েছে?

কি হয়েছে, তা তো আমরা পঞ্চম বা সর্বশেষ সংস্করণে প্রত্যক্ষই করছি। কিন্তু পূর্বে সে কেমন ছিল? তার পূর্বের চরিত্র থেকে তাকে কতখানি 'শান্ত' করা হয়েছে এবং কিভাবে করা হয়েছে তা অবশ্যই কৌতূহলের ও লক্ষ্য করবার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, শান্তিকে যে শুধু শান্ত করা হয়েছে তাই নয়, "তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার [পঞ্চম সংস্করণে] একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে ক্রমেই তাঁর পাঠকসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। রুচির দিক থেকে পরিণত বয়সে তিনি অনেক বেশি পরিশীলিত হয়েছিলেন। নিজের রচনারই যেখানে যেখানে পরবর্তীকালে তেমন রুচিকর বলে মনে হয়নি সে-সকল স্থান তিনি নির্দ্বিধায় বর্জন করেছেন। পাঠক সাধারণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। সব কিছুই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া গেল, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পাঠক তার সাহায্যেই অ-ব্যক্ত বা অ-কথিত অংশ উপলব্ধির অধিকার রাখে। যে-পাঠক বিস্তারিত বর্ণনার অভাবে অসুখী অতুষ্ট, উপন্যাসের মধ্যে প্রয়োজন হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে কোথাও কিঞ্চিৎ তিরস্কার কোথাও একটু বিদ্রূপ করেছেন সুযোগ বুঝে। রাজসিংহ উপন্যাসের মধ্যে চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে নির্মলকুমারী ও মাণিকলালের বিবাহ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "বোধ হয়, কোর্ট্‌শিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছুই নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিক!' সে সব কিছুই নাই—ধিক্!" এ রকম নানান্ মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

বঙ্গদর্শনে বা আনন্দমঠের প্রথম চারটি সংস্করণে যে-ভার পাঠকের ওপর ছিল, পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন করে কেন সে-ভার আপনার স্কন্ধে নিলেন? আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৯২। দশ বৎসরে পাঠকের উপলব্ধি বা গ্রহণশক্তি

কি হ্রাস পেয়েছে? নাকি, সত্যই এতদিন শান্তি চরিত্র ব্যাখ্যায় অসম্পূর্ণতা ছিল? এবং তাই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষ সংস্করণে শান্তি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

আনন্দমঠের প্রথম চার সংস্করণের বা বঙ্গদর্শনের পাঠক শান্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে পারেন।

এক, জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি কেন আপন শ্বশুরালয়ে না থেকে জীবানন্দের ভগিনী নিমাইয়ের গৃহের পাশে পর্ণকুটিরে একাকী বাস করে? নিমাইয়ের গৃহে জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির সাক্ষাৎ ঘটার পর শেষে জীবানন্দ শান্তিকে বলেছিল, "আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর!"

শান্তির শ্বশুরালয় ত্যাগের কারণ কি?

দুই, শান্তির কাছে কাব্য সাহিত্য অলঙ্কার ব্যাকরণের পুঁথি কি ভাবে ছিল, যেগুলি সে গৃহত্যাগের পূর্বে অগ্নিতে বিনষ্ট করে? জীবানন্দ শান্তিকে দেখে ফিরে গেলে শান্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে একাকী ধীরে ধীরে পুরুষবেশধারী এক সন্ন্যাসীমূর্তি ধারণ করল। তারপর সে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। "নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কোথায় নাই নিশ্চিত বুঝিয়া, অতি গোপনে সংরক্ষিত একটি পেটিকা খুলিল। খুলিয়া তাহা হইতে একটি মোট বাহির করিল। মোট খুলিয়া তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহা মাটির উপরে সাজাইল। কতকগুলি তুলটের পুঁথি। ভাবিল 'এগুলি কি করি, সঙ্গে লইয়া গিয়া কি হইবে? এত বা বহিব কি প্রকারে? রাখিয়া গিয়াই বা কি হইবে? রাখারই বা আর প্রয়োজন কি—দেখিয়াছি জ্ঞানেতে আর সুখ নাই, ভস্মরাশিমাত্র—ও ভস্ম ভস্মই হোক।'—এই বলিয়া শান্তি সেই গ্রন্থগুলি একে একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আর কি কি তাহা এখন বলিতে পারি না, পুড়িয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল।"

তিন, শান্তি সামান্য গৃহবধূ হয়ে কি প্রকারে সন্ন্যাস গ্রহণকালে ভবানন্দের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল? যে-শক্তিপরীক্ষায় অনেক সন্ন্যাসীই উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়নি সেখানে স্ত্রীলোক হয়ে শান্তি সফল হল কিরূপে?

চার, জীবানন্দের অনুপস্থিতিতে যে বধূটি ঘরের কোণে বসে একাকী চরকা কাটছিল, সেই স্ত্রীলোক কোনরূপ অনুশীলিত না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে

সন্তানসেনা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়? "জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। তাহারা যখন আম্রকাননে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে একজন বলিল, 'গাছে উঠ! গাছে উঠ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।' ত্রস্ত সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল। গাছের উপর হইতে নবীনানন্দ গোস্বামী কথা কহিতেছিল। সকলে গাছে উঠিলে, নবীনানন্দ বলিলেন, 'বন্দুক তৈয়ারি রাখ—এখান হইতে আমরা নিরাপদে শত্রুসংহার করিব।' সকলে বন্দুক তৈয়ার রাখিল।"

উপরে লিখিত প্রশ্নগুলির কোন সদুত্তর উপন্যাসের মধ্যে ছিল না, এমন কি পাঠকের পক্ষে 'অনুভবে বুঝিবার'ও কোন অবকাশ ছিল না। আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শান্তি চরিত্রের অস্বাভাবিকতা ও আতিশয্য লক্ষ্য করে তাকে অনেকটা 'শান্ত' করেছেন এবং শান্তি চরিত্রের পূর্ব-ইতিহাস বিবৃত করে তাকে অনেক পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। পঞ্চম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শান্তির বাল্য ও শৈশবজীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই বিবরণ পূর্ববর্তী কোন সংস্করণে ছিল না। এই নূতন পরিচ্ছেদটি সংযোজিত হওয়ায় এবার জানা গেল, শান্তিকে কেন জীবানন্দের পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, শান্তির ঘরে কেন কাব্য সাহিত্য অলঙ্কার ব্যাকরণের পুঁথি থাকত এবং কিভাবেই বা স্ত্রীলোক হয়েও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারিণী সে হয়েছিল।

আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শান্তির অনেক শক্তি খর্ব করেছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় বঙ্কিম এবারে সন্তানসেনাদের যুদ্ধস্থল থেকে শান্তিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। প্রথম সংস্করণের একটি অংশ উদ্ধৃত করি। "নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল 'মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে, এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই। মার মার ফৌজদারী মার।' তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপ্লুত স্থানচ্যুত বিদ্রাবিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন-ভিন্নভাবে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দের দলে এবং নবীনানন্দের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল

না 'ছি! নারীজন্মেই ধিক!' এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। যেখানে দুই বিজয়ী সন্তানসেনার সম্মিলন হইয়াছে সেইখানে কুরঙ্গীর ন্যায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রের মাঝখানে জীবানন্দে নবীনানন্দে দেখা হইল।"—প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম-কর্তৃক এ অংশ বর্জিত হয়েছে। তাই সংশোধিত সংস্করণে শান্তি আর নারীজন্মের প্রতি ধিক্কার দেবার সুযোগ পেল না।

পঞ্চম সংস্করণে শান্তিকে শান্ত করা হল; তাতে শান্তির ভাল হল কি মন্দ হল—সেটার বিচার আবশ্যক। আমার মনে হয়েছে, শান্তিকে শান্ত করে উক্ত চরিত্রের গৌরব মহিমা ও তীক্ষ্ণতা অকারণে হ্রাস করা হয়েছে। শান্তি চরিত্র ততক্ষণই অবিশ্বাস্য ছিল যতক্ষণ আমরা তার বাল্য ও শৈশব জীবনের সঙ্গে অপরিচিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শান্তির অবিদিত জীবনের চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই অংশ পাঠের পর শান্তিকে সন্তানসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখাই স্বাভাবিক প্রত্যাশিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শান্তিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত করে তার তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতা লাঘব করে তার চরিত্রের বিশিষ্টতা ও গৌরব অনেক পরিমাণে বিনষ্ট করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি উপন্যাসে শান্তির কৈশোর জীবনের ইতিহাস সংযোজন না করতেন, তাহলে শান্তিকে শান্ত করার প্রয়োজনটা যথার্থ হত। কিন্তু শান্তির কৈশোরজীবনের চিত্র বর্ণিত হবার পর শান্তির শক্তি খর্ব করার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু না কিছু সংশোধন সংযোজন করে গেছেন। কখন চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে কখন কাহিনী রূপান্তরিত হয়েছে কোথাও বক্তব্য সংস্কৃত হয়েছে কোথাও বা ভাষারীতি মার্জিত হয়েছে কোন ক্ষেত্রে বা ব্যাকরণে ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে। এই সংযোজন পরিবর্তনের ফল আমাদের বিচারে কোথাও ভাল হয়েছে, কোথাও ভাল হয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজের রচনায় যখনই যেখানে সংশোধন বা পরিবর্তনযোগ্য মনে করেছেন তখনই তিনি সংশোধন ও রূপান্তর করেছেন। মত পরিবর্তনে বা ত্রুটি সংশোধনে বঙ্কিমচন্দ্র কখন দুর্বলতা অনুভব করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করেই এ আলোচনা সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় বারের (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে?...মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।"

কাব্য কি, কাব্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত, কাব্যের ক'টি শাখা, মহাকাব্য-নাটক-গীতিকাব্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, সাহিত্যে অনুকরণের স্থান কতখানি, ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক কি, অশ্লীলতা কি ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে উত্থাপন করেছেন এবং সেগুলির মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি অনেক মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি সংকলন করে তাঁর সাহিত্যাদর্শের স্বরূপটি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

কাব্যের ক'টি শ্রেণী, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোথায় কি প্রভেদ, কার কি বৈশিষ্ট্য—এই সকল বিষয় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে কাব্যকে অকারণে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা অর্থহীন এবং অনাবশ্যক। তিনি কাব্যকে মুখ্য তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। ক. দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি খ. আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য এবং গ. খণ্ডকাব্য। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের আলঙ্কারিকেরা কাব্যের আরো অনেক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতঃ বলেছেন, "ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলির বিভাগ অনর্থক বোধহয়।"—গীতিকাব্য।

এখন দেখা যাক লেখক দৃশ্যকাব্য আখ্যানকাব্য ও খণ্ডকাব্য বলতে কি বুঝেছেন এবং পরস্পরের মধ্যে কি বৈষম্য লক্ষ্য করেছেন।

দৃশ্যকাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, "দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ, এমত নহে।"—গীতিকাব্য। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা নাটক বস্তুত তা নাটক নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে তাঁর ব্যক্তব্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মিল্টনের রচিত Comus, বায়রনের Manfred ও গ্যেটের Faust গ্রন্থ তিনখানি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এই পুস্তক

তিনটি কথোপকথনে গ্রন্থিত হলেও এগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু নাটক নয়। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গ্যেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় 'Bride of Lammermoor'কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না।"—গীতিকাব্য। উদ্ধৃত অংশটি বিশ্লেষণ করলে কি দাঁড়ায়? বঙ্কিম-চন্দ্রের নিজস্ব মতামতটি কি? তিনি শকুন্তলা ও উত্তররামচরিত গ্রন্থ দুটিকে নাটক বলতে চান, নাকি অন্য কোন শ্রেণীভুক্ত করতে আগ্রহী? গ্যেটের বক্তব্য কি তিনি সমর্থন করেন?

শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতের প্রসঙ্গে পরে আসছি, প্রথমে গ্যেটের প্রসঙ্গে বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্র গ্যেটের উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করেন। গ্যেটের বক্তব্য সমর্থন করেন বলেই তিনি স্কটের Bride of Lammermoorকে নাটক হিসাবে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন শকুন্তলা ও উত্তররামচরিত প্রসঙ্গে বঙ্কিমের অভিমত কি? 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে, এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেক-গুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গ্যেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে।" এখানে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের মতামতকে অতিক্রম করে ইউরোপীয় সমালোচনার আদর্শকেই স্বীকার করে নিচ্ছেন। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে কালিদাসের শকুন্তলা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পাশ্চাত্য সমালোচনা অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত, শকুন্তলা নাটকের আকারে রচিত, কিন্তু নাটক নয়,

উৎকৃষ্ট উপাখ্যানকাব্য। এই দিক থেকে শকুন্তলা গ্রন্থটি কমাস, মানফ্রেড, ফাউষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়।

এখন দেখা যাক, কালিদাসের শকুন্তলায় শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট নাটকের কোন্ গুণ অনুপস্থিত? এ কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিম ওথেলো গ্রন্থটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ইউরোপীয় সমালোচনা অনুসারে ওথেলো যথার্থ নাটক, কিন্তু টেম্পেষ্ট বা শকুন্তলা নয়।

কেন নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "দেস্‌দিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যান-প্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
> বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না, সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দি-মোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।"—শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশে যা উদাহরণের মাধ্যমে বলেছেন, তাই তত্ত্বাকারে ব্যাখ্যা করেছেন 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে। সেখানে বলেছেন, "যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার

সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অনমুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।"

বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর বলেছেন, "উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন এবং তত্তৎ কার্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।"

'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ—তা শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট বা কালিদাসের শকুন্তলায় নেই। নাটকের লক্ষণগুলি ওথেলোতে যে-পরিমাণে আছে এই দুই গ্রন্থে সে-পরিমাণে নেই। ওথেলোকে যথার্থ নাটক বলে উল্লেখ করা চলে, কিন্তু টেম্পেষ্ট বা শকুন্তলা নাটক নয়, উপাখ্যানকাব্য। 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দা, ও শকুন্তলার সঙ্গে দেস্‌দিমোনার তুলনা করেছেন। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণকে পাশাপাশি রেখে সীতা বিসর্জন কালে ও

তৎপরে রামের ব্যবহারের তারতম্য আবিষ্কার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আবার ভবভূতির সৃষ্ট রামের ওই বিলাপের সঙ্গে দেস্‌দিমোনাকে হত্যার পর ওথেলোর বিলাপের তুলনা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র ওথেলোকে নাটক বলে উল্লেখ করেছেন, অপর দিকে টেম্পেষ্ট শকুন্তলা উত্তরচরিত তাঁর মতে যথার্থ নাটক নয়। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এই গ্রন্থের কোথায় কোথায় নাট্যচ্যুতি ঘটেছে। গীতিকাব্যকারের যে অধিকার নাট্যকারের সে অধিকার নয়। দেস্‌দিমোনার বধের পর "সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। বক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। সহজেই অনুমেয় যে, যাহা বক্তব্য, তাহা পরসম্বন্ধীয় বা কোন কার্যোদ্দিষ্ট, যাহা অবক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখনো নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুসঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।" 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনায় উক্ত গ্রন্থকে তাই অনেক ক্ষেত্রে তিনি কাব্য রূপে সমর্থন করেছেন, কিন্তু নাটক হিসাবে নয়। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কের সারমর্ম উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, "এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা [এই অঙ্কের প্রসঙ্গ] নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহাকিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রাম বিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয়

হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।"

নাটকের আর একটি বড় লক্ষণ ক্রিয়াপারম্পর্য ও ঘটনার কালগতনৈকট্য। উত্তরচরিতের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। একস্থানে বলেছেন, "উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগতনৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইণ্টার্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।" অপর একস্থানে বলেছেন, "তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য বড় মনোহর নহে; এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক-নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি ম্যাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিত ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে।" ক্রিয়াপারম্পর্যে ও ঘটনার দ্রুতসম্পাদনের দিক থেকে ম্যাক্‌বেথ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক; উইণ্টার্স টেল বা উত্তরচরিত সেই দিক থেকে উৎকৃষ্ট নয়।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য প্রসঙ্গে কি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, গীতিকবিদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ করেছেন কি না, এই সকল শ্রেণী বিভাগে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ও অভিমত কি—ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাবে।

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। উক্ত সমালোচনাটি পরে কিছু অংশ বর্জন করে বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত করেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, এবং ইতিহাসের দিক থেকে বলা চলে এটিই হল বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্য সম্বন্ধে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" উদ্ধৃত অংশটি দেখে প্রশ্ন জাগবে গীতের উদ্দেশ্য কি, এবং সংগীত ও গীতিকাব্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা কথাটির অর্থ কি? মানুষ তার মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করে, কিন্তু সেই ভাব উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সঙ্গে প্রকাশ করলে অধিকতর স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত কণ্ঠভঙ্গী বা স্বরভঙ্গীর যোগে বক্তার ভাবের উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হয়। এখন প্রশ্ন, সংগীত কি? না, বক্তার এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই হল সংগীত। কিন্তু অর্থহীন কণ্ঠধ্বনি কি সংগীত? অর্থশূন্য স্বরভঙ্গীর দ্বারা সুর পরিবেশিত হতে পারে, কিন্তু তা সংগীত নয়। মনের ভাবকে অর্থযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করতে গিয়ে বক্তার স্বরভঙ্গীতে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাই সংগীত। এখন সংগীত ও গীতিকাব্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায় দেখা আবশ্যক। সংগীতের দুটি উপাদান—শব্দ ও স্বর। প্রথমতঃ হল, নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস অর্থাৎ যাকে বলা চলে শব্দ। এবং দ্বিতীয় হল স্বরচাতুর্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।"

এখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের এত বাহুল্য কেন? জয়দেব থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস রামপ্রসাদ সেন কবিয়াল রাম বসু হরু ঠাকুর নিতাই দাস আধুনিক যুগে মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র—এঁরা সকলেই এক একজন বড় গীতিকবি। উৎকৃষ্ট গীতিকবি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রই এঁদের নাম বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু কেন বাঙলা দেশে গীতিকবি ও গীতিকাব্যের বাহুল্য? এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই করেছেন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর এই ব্যাখ্যা অনেক পরিমাণে সমাজ ও ইতিহাসভিত্তিক। বিজ্ঞানে দেখি সকলই নিয়মের ফল। জল যেমন উপরের বাতাস ও নীচের পৃথিবীর

অবস্থানুসারে, নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মের অধীনে কোথাও বাষ্প কোথাও বৃষ্টি কোথাও শিশির কোথাও বা কুয়াশায় রূপান্তরিত হয় ; সেইরূপ সাহিত্য দেশ-ভেদে দেশের অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে রূপান্তরিত হয়। এক হিসাবে সাহিত্যকে দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করা যায়। জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ, পরবর্তীকালে মহাভারত পুরাণ ও কালিদাসের কাব্যাদি। ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গে অনার্য আদিম-বাসিগণের বিবাদের ফল রামায়ণ। অতঃপর অনার্য শত্রুসকল পরাজিত হল এবং আর্যগণের মধ্যে কে কতখানি ভোগ করবে এই নিয়ে আভ্যন্তরিক বিবাদ দেখা দিল। এই সময়কার কাব্য মহাভারত। এইরূপে ক্রমে দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে পুরাণের আগমন এবং কালিদাসের ন্যায় কবির আবির্ভাব।

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ থেকে কিভাবে বাংলা গীতিকাব্যের আবির্ভাব ঘটল? "ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিণী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি-চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।" —বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে গীতিকাব্যের বাহুল্যের কারণ নির্দেশ করেছেন।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদের বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ দুটি দলে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর কবিদের প্রধান জয়দেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র হলেন

বিদ্যাপতি। প্রথম শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ই প্রধান স্থান গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।" অতঃপর বলেছেন, "আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।" এখন সতর্ক পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধের নাম 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং যে রচনায় লেখক স্পষ্টই বলেছেন 'প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক', সেই লেখার লেখক কেন বলছেন, 'বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদি কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত' এবং 'যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।' যে-মন্তব্য গোবিন্দদাস বা চণ্ডীদাস প্রসঙ্গেই সঙ্গত ও যথার্থ, যা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না—সে ক্ষেত্রে লেখক কেন শ্রেণীর 'মুখপাত্র' হিসাবে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ না করে বিদ্যাপতির নামোল্লেখ করেছেন। জয়দেব-শ্রেণী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, 'যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে।' কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী, যে শ্রেণীর মুখপাত্রের নাম বিদ্যাপতি, সেই শ্রেণীর প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র কেন বললেন, যা বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বেশি খাটে না। এরূপ ঘটবার কারণ কি? এখানে তো দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই নিজের মতের সমালোচনা ও সংস্কার করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্ররূপে বিদ্যাপতির নামোল্লেখে আপত্তি থাকলে, লেখক কেন সেখানে বিদ্যাপতির পরিবর্তে গোবিন্দদাস বা চণ্ডীদাসর নামোল্লেখ

করলেন না? কেন প্রবন্ধের নাম হল না গোবিন্দদাস ও জয়দেব, কিংবা চণ্ডীদাস ও জয়দেব?

বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'মানসবিকাশ' এই নামে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'মানস বিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা। 'মানসবিকাশ' সমালোচনাটিই পরবর্তীকালে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংগৃহীত হলেও, দু-এক স্থলে পূর্ববর্তী পাঠের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে প্রথমে পূর্ববর্তী পাঠ ও পরে পরবর্তী পাঠের উল্লেখ করা হল।

(ক) প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি।

(খ) প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া হউক।

(ক) যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।

(খ) ...যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রথমে যা বলেছেন পরবর্তীকালে তা আর বলতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন—বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খাটে না। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধটি সংশোধন করবার জন্য বেশি সময় দিতে পারেন নি। অল্পস্বল্প সংশোধন না করে বঙ্কিমচন্দ্র যদি পুনরায় লিখতেন তাহলে প্রবন্ধটি ত্রুটিমুক্ত হত। পাঠান্তরের ইতিহাসটি যদি না বুঝতাম তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের দ্বিধাগ্রস্ততার কারণ আমাদের কাছে অস্পষ্টই থেকে যেত।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক গীতিকাব্য লেখকদের একটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করতে চেয়েছেন। এই কবিদের সম্পর্কে প্রবন্ধকারের বক্তব্য, "তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব-

কবিগণ কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী —বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধ-গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।” বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত আধুনিক কোন সমালোচকই সম্ভবত সমর্থন করবেন না। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবেত্তা আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ হলেই যে তাঁর রচিত কবিতায় প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব ঘটবে—এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাচীন-কালেও অনেক কবি ছিলেন—তাঁরা বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ নন, কিন্তু তাই বলে তাঁদের সকলেরই কবিত্ব প্রগাঢ়—অবশ্যই তা নয়। প্রাচীন বৈষ্ণবপদকর্তা জ্ঞানদাসের কবিত্বের যে প্রগাঢ়তা, মাধবদাস বা দেবকীনন্দনের সে প্রগাঢ়তা নেই; রামেশ্বর ভারতচন্দ্রের সমতুল্য নন, আবার রাজসভাকবি ভারতচন্দ্রের তুলনায় আধুনিক কালের কবি মধুসূদনের কবিত্বের প্রগাঢ়তা ও উৎকর্ষ বেশি বই কম নয়।

‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধের শেষ স্তবকে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি তা নিরূপণ করেছেন। লেখকের মতে, “কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই

সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth." এখানেই 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের শেষ; কিন্তু মূল প্রবন্ধ 'মানস বিকাশে' ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। সেখানে আছে, "ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।" এর পরেও আরও একটি ছোট স্তবকে কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র মধুসূদনের কথা আছে। পরবর্তীকালে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে এই স্তবকটি পরিত্যক্ত হয়। এখানে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ হিসাবে কালিদাস ও জয়দেব এবং আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ স্বরূপ পোপ ও জনসনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। পাঠ-সংশোধনের পটভূমিকায় সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। লেখক পরে অনুভব করেছেন, কালিদাস ও জয়দেব সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন তা কেবল জয়দেব সম্বন্ধেই খাটে কালিদাসের ক্ষেত্রে নয়; এবং পোপ ও জনসন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা পোপ ও জনসন সম্বন্ধে ততখানি খাটে না যতখানি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে খাটে।

কাব্যরসের সামগ্রী কি, কাব্যমধ্যে অতিপ্রকৃতের স্থান কোথায় ও কতখানি —এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট অভিমত লক্ষ্য করা যায়। "কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।"—(প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত)। কিন্তু মহাকাব্য প্রভৃতি রচনায় শুধু যে মনুষ্য চরিত্রই চিত্রিত হয় তা নয় অনেক সময় 'অতিমানুষ' বা দেবচরিত্রও কবিকে সৃজন করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন, এই অতিমানুষ বা দেবশ্রেণীর চরিত্রকে কাব্যমধ্যে কিভাবে গ্রহণ করা হবে? পাঠক বলতে পারেন—কেন, অতিপ্রকৃত অতিমানুষ রূপেই চিত্রিত করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন অতিপ্রকৃত চরিত্রনির্মাণে কিছু বাধা আছে। তাঁর মতে অতিপ্রকৃত বা দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ

কারণ এই যে, যা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নয়, তার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মায় না। সুতরাং কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের নিয়ম কি হওয়া উচিত? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর, "যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।" নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লেখক দুটি প্রাচীন গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একটি সংস্কৃত কাব্য কুমারসম্ভব ও অপরটি মিলটনের Paradise Lost। উভয় কাব্যেই দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র মূল বিষয়। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে Paradise Lost এর তুলনায় কুমারসম্ভব উৎকৃষ্টতর বলে প্রতিভাত হয়েছে। মিলটনের অপেক্ষা কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, "দেবচরিত্র প্রণয়নে তিনি মিলটন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমার-সম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিলটন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রা-নুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।" অর্থাৎ যা প্রকৃত, তা যেসকল নিয়মের অধীন কালিদাসের সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়ায় মাধুর্যবিশিষ্ট হয়েছে ও পাঠকের সহৃদয়তা লাভ করেছে।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে অনুকরণ, প্রভাব ইত্যাদির মূল্য ও স্থান কতখানি—পর্যালোচনা করেছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য, "অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে।" এ কেবল সাহিত্য প্রসঙ্গে নয়, সমাজের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য বলে তাঁর ধারণা। আমরা এখানে কেবল সাহিত্যের দিকটাই লক্ষ্য করব।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বক্তব্য, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ

প্রাপ্তি হয় না—এ কথা ঠিক নয়। উদাহরণ হিসাবে লেখক বলেছেন, পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর অনেক কাব্যই কেবল অনুকরণ মাত্র। "ড্রাইডেন এবং বোয়ালের অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জিলের মহাকাব্য, হোমারের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমক সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।" এই দু'য়ের প্রথমটি রামায়ণ শেষোক্তটি মহাভারত।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় বক্তব্য, প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ 'বড় কদর্য' বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। অক্ষম ব্যক্তির অনুকরণই ঘৃণাকর, নচেৎ অনুকরণমাত্রই ঘৃণ্য বা দূষ্য নয়। যার যে বিষয়ে শক্তি প্রতিভা বা স্বাভাবিক প্রবণতা নেই সে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে কখন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় না। নিজের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় নাটককে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। "ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী [গ্রীক] নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল।" উদাহরণ সাহায্যে বোঝান হল, প্রতিভার গুণে কেউ অনুকরণ করেও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে আবার কেউ শক্তিশূন্যতার কারণে অনুকরণ করে কেবল অনুকারী বলেই লোকসমক্ষে প্রতিভাত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, প্রতিভাশালী অনুকারীর ক্ষেত্রে কি কোন দোষ লক্ষিত হতে পারে না? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন দুটি বড় দোষ ঘটতে পারে। প্রথমটি হল

বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। "এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত ?···মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?" এটি হল বৈচিত্র্যের দোষ, প্রথম দোষ। দ্বিতীয় ত্রুটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সকল বিষয়েই যত্ন-পৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্তী কার্য পূর্ববর্তী কার্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কার্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।" অর্থাৎ সুফল কুফল সব মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য হল, প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে অনুকরণ অনিষ্টকারী নয়। সাধারণভাবে অনুকরণকে নিন্দার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অনুকরণ সর্বদা ঘৃণ্যবস্তু নয়, তার দ্বারাও অনেক সময় গুরুতর সুফল জন্মাতে পারে।

অশ্লীলতা সাহিত্যের একটি বড় প্রশ্ন। অশ্লীলতা কি, অশ্লীলতা কাকে বলব —যুগে যুগে এবিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। একজনের কাছে যেটা অশ্লীল আর একজনের কাছে সেটা অশ্লীল বলে বোধ নাও হতে পারে। শুধু ব্যক্তি বিশেষ কেন, এক দেশের কাছে যা শ্লীল অন্যদেশের কাছে তা-ই অশ্লীল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, "যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।" আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি অশ্লীলতার সংজ্ঞা সকল দেশে সমান নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। ইংরেজের কাছে যা নিতান্তই রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল, আমাদের চোখে তা অশ্লীল বলে প্রতিভাত নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ দিয়েছেন, "ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের

কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা পবিত্র কার্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ।] ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্নরকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ-স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য হল, বিদেশী রুচির অনুকরণে নয়, দেশীয় রুচি সংস্কৃতি ঐতিহ্যের পটভূমিতে শ্লীল অশ্লীল বিচার করা বাঞ্ছনীয়। লেখক বা কবি যদি সত্যই ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ গ্রন্থ রচনা করে না থাকেন, তবে তা কোন কারণেই অশ্লীলতা প্রাপ্ত হতে পারে না। একটি উপমার মধ্যে উপমেয় বস্তুটি স্বতন্ত্র ভাবে অশ্লীল কি না দেখবার প্রয়োজন নেই, সামগ্রিকভাবে সেই উপমাটির

মধ্য দিয়ে কি ভাবটি প্রকাশিত হচ্ছে তাই লক্ষ্য করা আবশ্যক। সেই ভাব যদি মহৎ হয়, তবে উপমেয়টিও অশ্লীল নয়।

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী লেখকদের প্রতি কতকগুলি উপদেশ নির্দেশ করেছেন। এই প্রবন্ধে একদিকে নিতান্ত টেকনিকাল কথা বলা হয়েছে। যেমন, "যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না।" আবার অন্য দিকে সাহিত্যের যথার্থ সত্য কোথায়, সেই সত্য লেখক কিভাবে গ্রহণ করবেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার নির্দেশ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।" আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তির প্রাবল্য অনিষ্টকর বলেছেন। সাহিত্যে যে লোকরঞ্জনের অবকাশ নেই—তা নয়, তবে কেবল লোকরঞ্জন করাই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে লিখেছেন, "আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।…কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন-প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা যাইতে পারে না।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লোকরঞ্জন বা চিত্তরঞ্জনই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি হবে? —এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

লেখকদের প্রতি নিবেদনে বঙ্কিম বলেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন

যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যসৃষ্টির দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য। এক, মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন এবং দুই, সৌন্দর্যসৃষ্টি। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয়ের একত্র সমাবেশ নির্দেশ করেন নি। বলেছেন একটি অথবা অপরটি। অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি নাই হয় তবে যেন মানুষের মঙ্গলসাধনটুকু হয়, আর মানুষের মঙ্গলসাধন যদি করতে না পার তবে অন্তত সৌন্দর্য সৃষ্টি কর।

সত্য এবং ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—সাহিত্য সম্পর্কে এটিও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অভিমত। তাঁর বক্তব্য, "যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।" বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এখানে সত্য ও ধর্ম—এই দুটি শব্দের অর্থগত বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন আরও বিস্তারিতভাবে। সেখানে লেখক বলেছেন, "সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না।" সুতরাং এতদূর পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই দাঁড়াল যে, মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনকারী অথবা শুধুমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী যে রচনা—যা সত্য ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিশুদ্ধ সাহিত্য।

বাঙলার লেখকদের প্রতি নিবেদন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বক্তব্য হল, "কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য পাঠকালে অবশ্যই তাঁর রচিত 'অনুকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য মনে পড়া স্বাভাবিক। সেখানে সাহিত্যে অনুকরণ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে যা বলেছেন সে কথাই তাঁর মূল বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। লেখকদের

প্রতি নিবেদন প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে যে কথা বলেছেন তা তাঁর বক্তব্যের সামান্য অংশমাত্র।

লেখার উদ্দেশ্য সত্যস্থাপন, ধর্মপ্রতিষ্ঠা বা সৌন্দর্যসৃষ্টি করা। কিন্তু একটি রচনার যথার্থ সার্থকতা কোথায়? অবশ্যই পাঠকের উপলব্ধির মধ্যে। সৌন্দর্য সৃষ্টি করলাম, সত্য প্রতিষ্ঠা করলাম, সেই রচনার মধ্যে ধর্মও সংস্থাপিত হল; কিন্তু যা লিখলাম, যে ভাষায় প্রকাশ করলাম তা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হল না। সুতরাং রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। বক্তব্যের মধ্যে হয়ত সত্য আছে, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের অক্ষমতার জন্য রচনাটির সম্পূর্ণ মূল্যহানি ঘটল। সুতরাং বক্তব্যকে কোন্ ভাষায় পাঠকের কাছে ব্যক্ত করব? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।" 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র রচনার সরলতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, "রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—

তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আর্‌বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।" 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সূত্রাকারে যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলি লেখকের কোন বিচ্ছিন্ন সাময়িক চিন্তার ফল নয়; সমগ্র সাহিত্যজীবন ধরেই তিনি এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তাই সংক্ষিপ্ত নির্দেশের মধ্যে যে বক্তব্যটি রয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর রচনার কোন না কোন অংশের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সংগীত একজন রচনা করেন, অপর একজন তা গীত করেন। 'দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, একই ব্যক্তি একাধারে সমালোচক ও স্রষ্টা, এমন দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি সাহিত্য-সমালোচকরূপে যে সকল বিষয়ে চিন্তা করেছেন ও যে সকল ব্যাখ্যান নির্দেশ করেছেন, আপনার সৃষ্ট রচনাতেও লেখক তা বহুল পরিমাণে গ্রহণ ও অনুসরণ করে গিয়েছেন।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমের একটিমাত্র কাব্য ও তিনখানি উপন্যাস ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে নি। বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকে তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব' অধ্যায়ে আমরা তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা দেশের ইতিহাসের মত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল বিশেষ কৌতূহল এবং আগ্রহ। বিষয়টির প্রতি তাঁর যথেষ্ট সচেতন দৃষ্টি ছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের Bengali Literature শীর্ষক দীর্ঘ ইংরেজি রচনাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেই রচিত। তখনও লেখক বাংলা প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ Essays and Letters গ্রন্থে (১৯৪০ খ্রী) প্রবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোন ইংরেজি গ্রন্থ সংকলন করে যান নি বলে এই মূল্যবান রচনাটিও তাঁর কোন গ্রন্থে সংগ্রহের সুযোগ ঘটে নি। প্রবন্ধটি তাই বঙ্কিম-পাঠকবর্গের অনেক সময়েই চোখ এড়িয়ে যায়।

রচনাটি সংকলন প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। সম্পাদকদ্বয় জানিয়েছেন, "This article appeared in *The Calcutta Review* for 1871, No. 104, pp. 294-316. In those days it was customary to publish the articles in *The Calcutta Review* without the names of their contributors. Early in the eighties, the publishers of *The Calcutta Review* arranged to reprint some of the important articles hitherto pnblished in it in a series of volumes entitled *Selections from The Calcutta Review*; a prospectus was thus issued which gave a list of the articles intended for reprint, along with the names of their contributors ascertained from the office records. We find from this prospectus that Bankim Chandra was the writer of the article on 'Bengali Literature' which, however, never appeared in the *Selections.*"

এই প্রবন্ধে লেখক জয়দেব বিদ্যাপতি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এই রচনাটিতে বঙ্কিম নিজেই নিজের গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে লেখাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কোন রচয়িতার নাম ছিল না।

শুধু যে এই প্রবন্ধটিতেই বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেছেন তা নয়, অন্যান্য কিছু কিছু প্রবন্ধেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', এবং 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটি এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়বে। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের নিবন্ধগুলিও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। Bengali Literature প্রবন্ধে বঙ্কিম যে-সকল বাঙালী লেখকের আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কোন কোন লেখক বা কবি সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালেও আলোচনা করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলোচনার মধ্যে কোন লেখক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কিংবা পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রয়েছে কি না—তা লক্ষ্য করা যাবে। ইংরেজি প্রবন্ধটি বঙ্কিম যখন লেখেন তখন তিনি ছিলেন কেবল একজন ঔপন্যাসিক, কিন্তু পরবর্তী-কালের প্রবন্ধগুলি যখন লেখেন তখন হয় তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করছেন নয়তো করে এসেছেন।

Bengali Literature প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছেন, "He is the father of modern Bengali." ভারতচন্দ্র যদি আধুনিক যুগের জনক হন, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়টা হল প্রাচীন যুগ। এই প্রাচীন যুগের লেখকদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করেছেন বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিম বিদ্যাপতি এবং জয়দেবকে একত্রে আলোচনা করেছেন। মুখ্যতঃ কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধনির্ণয় প্রসঙ্গে উভয় কবিকে দুই প্রতিনিধি স্থানীয় কবি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু জয়দেব বা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্বতন্ত্র বক্তব্য কি? Bengali Literature প্রবন্ধে জয়দেব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য হল, "The only Bengali Sanskrit poet of any eminence was

Jayadeva, and he does not stand in the first rank. There is not one Bengali name which can compare with those of Kalidasa, Magha, Bharavi and Sriharsa." জয়দেবের পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির কথা বলেছেন। "It is difficult to determine the date of the oldest Bengali writers, but probably few of their books are more than three hundred years old. Vidyapati, whose lyrics are perhaps the finest in the language, is certainly one of the first." এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির রচনাকে বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদকরূপে পরিচিত হলেও তাঁরা শুধুমাত্র অনুবাদক নন। মূল রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করলেও তাঁদের গ্রন্থে যথেষ্ট মৌলিক কবিশক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। বঙ্কিমের মন্তব্য, "We do not mean to say that they improved upon the originals, unless it were by greatly curtailing the tremendous bulk of the Sanskrit compositions ; but the new matter which they added, while it detracts from the grandeur of the original conceptions of the Sanskrit poets, would, if embodied in some other form, have given them a certain position among original writers." কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম যোগ্য কারণেই সেকালে অধিকতর সমাদৃত হয়েছিলেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস বা মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভা স্বল্প না হলেও বৈষ্ণব কবিদের তুলনায় উৎকৃষ্ট নয়। বঙ্কিমের ভাষায়, "In poetic power they are decidedly inferior to the best of the Vaisnava poets." বঙ্কিম Bengali Literature প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেবল বিদ্যাপতির নামোল্লেখ করেছেন, যদিও 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে লেখক বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামও সমমর্যাদায় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের নাম বৈষ্ণব পদাবলীর উৎকৃষ্ট কবি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিম গুপ্তকবির কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত কি, তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নেই। ভারতচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমের মনোভাব কি? ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনায় ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত বঙ্কিমের বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলি এখানে সংগ্রহ করা যেতে পারে। একস্থানে লেখক বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন।" ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য, "প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা-মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না।" ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা প্রসঙ্গে ভারত-চন্দ্রের কথা এসেছে। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের অনুগামী, আবার অনুগামীও নন। বঙ্কিমের উক্তি, "ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর এক ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না।" এই সকল কথা বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন তার কুড়ি বৎসর পূর্বে এই লেখক বা কবিদের সম্পর্কে কি কথা বলেছেন এবং কিভাবে চিন্তা করেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

Bengali Literature প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "Bharat Chandra is chiefly known by his *Vidya Sundara* and his *Annada Mangal*. Neither work has much merit, though an exception must be made in favour of the character of Hira, the flower-girl, a coarse but racy and vigorous portrait, not equalled by anvthing of its kind in Bengali. One other great distinction, however, must be accorded to Bharat Chandra. He is the father of modern Bengali. His versification, too, is very good, and it is the model followed by many distinguished poets of the present day, as, for instance, Babu Ranga Lal Banerji. In the higher attributes of a poet, Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him. His works are

disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits them for republication at a time when Bengali readers are not all of the rougher sex." ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য। দেখা যাচ্ছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা একই অভিমত উপস্থাপিত করে এসেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। বঙ্কিমের বাল্যকালের অনেক রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল, যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। একদা ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' কিশোর বঙ্কিমের অনেক রচনার সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন, পরে এমন একদিন এল যেদিন বঙ্কিমই ঈশ্বর গুপ্তের সমালোচনা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখনই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা করেছেন তখনই তাঁর জীবনকথারও উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ও তার কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই স্বতন্ত্ররূপে দেখতে চান নি। Bengali Literature প্রবন্ধেও তা লক্ষিত হয়। এখানে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও গদ্য উভয় রচনারই আলোচনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বিশ বৎসর পরে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় সে কথাই আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন মাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ; অর্থাৎ Bengali Literature প্রবন্ধটি রচিত হয় গুপ্তকবির মৃত্যুর মাত্র বার বৎসর পরে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে লিখেছেন, "He was a very remarkable man. He was ignorant and uneducated. He knew no language but his own, and was singularly narrow and unenlightened in his views ; yet for more than twenty years he was the most popular author among the Bengalis. As a writer of light satiric verse, he occupied the first place, and he owed his success both as a poet and as an editor to this special gift. But there his merits ended. Of the higher qualities of a poet he possessed none, and his work was extremely rude and uncultivated. His writings were generally disfigured

by the grossest obscenity. His popularity was chiefly owing to his perpetual alliteration and play upon words. We have purposely noticed him here in order to give the reader an idea of the literary capacity and taste of the age in which a poetaster like Iswar Chandra Gupta obtained the highest rank in public estimation. And we cannot even say that he did not deserve to be placed in the highest rank among his Bengali contemporaries, for he was a man of some literary talent, while none of the others possessed any. However much we may lament the poverty of Bengali literature, the last fifteen years have been a period of great progress and hope; within that time at least a dozen writers have arisen, every one of whom is immensely superior, in whatever is valuable in a writer, to this—the most popular of their predecessors.

Strange as it may appear, this obscure end often immoral writer was one of the precursors of the modern Brahmists. The charge of obscenity and immorality mainly applies to his poetry. His prose is generally free from both vices, and often advocates the cause of religion and morality."

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অপেক্ষা ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্র বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'Of the higher qualities of a poet he possessed none.' কিংবা 'সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।' শুধু যে Bengali Literature প্রবন্ধে বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিম একথা বলেছেন তা নয়। দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেও বঙ্কিমের উক্তি, 'কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।' ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিত্ব' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উক্তিই হল 'ঈশ্বর গুপ্ত কবি'। অথচ সর্বত্রই তিনি জানাচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত উন্নততর কবিশক্তির অধিকারী ছিলেন না, কিংবা তাঁর সৃষ্টিকৌশল বা

সৃষ্টিক্ষমতা ছিল না। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে বঙ্কিম-ব্যবহৃত এই 'সৃষ্টি' কথাটির অর্থ কি? এখানে আমরা সাহিত্যতত্ত্বের প্রশ্নের মধ্যে এসে পড়েছি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব' অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে বঙ্কিমের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি। "কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না, তদুভয়মধ্যে সৃষ্টি-চাতুর্য কিছুই নাই। সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকা লেখকের রচনামধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই। সৌন্দর্য এবং স্বভাবানু-কারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।" এই বিচারের মানদণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে কবি হিসাবে আখ্যা দিলেও, সুকবি হিসাবে কখনও চিহ্নিত করেন নি।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তিনি কি রকম কবি? কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেছেন ঈশ্বর গুপ্ত satirist। Bengali Literature প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন 'light satiric' কবিতা রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বর গুপ্তকে satirist বলে উল্লেখ করা হলেও ইংরেজি সাহিত্যের সংজ্ঞায় তাঁকে যথার্থ satirist কবি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। যে satire কেবল বিদ্বেষপ্রসূত, যা শুধু হিংসা অসূয়া অকৌশল নিরানন্দ ও পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ —সেই ব্যঙ্গ রচনার প্রতি বঙ্কিমের কখনও সমর্থন নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ শত্রুতা ও অনিষ্ট কামনা নেই। মেকির উপর রাগ ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের রচনার সবটাই রঙ্গ সবটাই আনন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'His writings were generally disfigured by

the grossest obscenity.' Bengali Literature প্রবন্ধে লেখক ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা সম্পর্কে এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলেন নি। কিন্তু পরবর্তী কালে বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতার যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নয়।

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধিক্ষণের কবি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের সূচনা তাঁর সময় থেকেই। এই ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অবস্থাটা কিরূপ? তার গতিপ্রকৃতি কি রকম? এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা মূল্যবান। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বাংলা গদ্যরীতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আজও বাংলা গদ্যরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের এই প্রবন্ধটি স্মরণ না করে উপায় নেই। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ সংস্কৃতানুসারী ভাষার নিন্দা ও টেকচাঁদি ভাষার প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমের অভিমত, "সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বহু পরিচিত ও বহু আলোচিত অভিমতটি 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের সাত বৎসর পূর্বে লিখিত Bengali Literature শীর্ষক ইংরেজি রচনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বাঙালী লেখক সম্প্রদায়কে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—'may be classed under two heads, the Sanskrit and the English Schools.' প্রথমোক্ত শ্রেণী সংস্কৃত বৈদগ্ধ্য ও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ভাবনা বহন করছেন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশি, উৎকৃষ্টতার বিচারে শেষোক্ত সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিকতর।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আলোচনা করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল।

"It may be said that there is not at the present day any-

thing like an indigenous school of writers, owing nothing either to Sanskrit writers or to those of Europe. The Sanskrit school takes for its models the later Sanskrit writers, and they are remarkably deficient in originality. The greater originality of the writers of the English school is the point in which their superiority to the Sanskrit school is most marked. It is characteristic of the Sanskrit school that they seldom venture on original composition. Even Vidyasagar's ambition soars no higher than adaptations and a few translations. When they do venture on original composition, they are rarely caught straying beyond the beaten track, beyond a reverential repetition of things which have been said over and over again from time immemorial. ...In point of style these writers hardly shine more than in ideas. Time-honoured phrases are alone employed ; and a dull pompous array of highsounding Sanskrit words continues to grate on the ear in perpetual recurrence. Anything which bears the mark of foreign origin, however expressive or necessary it may be, is jealously excluded. It was reserved to Tekchand Thakur to deal the first blow to this insufferable pedantry, and all honour to the man who did it. Endowed as he was with strong common sense as well as high culture, he saw no reason why this idol of unmixed diction sould receive worship at his hands, and he set about writing *Alaler Gharer Dulal* in a spirit at which the Sanskritists stood aghast and shook their heads. Going to the opposite extreme in point of style, he vigorously excluded from his works, except on very rare occasions, every word and phrase that had a learned appearance. His own works suffered from the

exclusion, but the movement was well-timed. In matter he scattered to the winds the time-honoured common-places, and drew upon nature and life for his materials. His success was eminent and and well-deserved."

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ মনোভাব ছিল? 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বঙ্কিম এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে বিদ্যাসাগরী ভাষা নিন্দার যোগ্য, কেন না তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুসারী এবং টেক-চাঁদের ভাষা প্রশংসার যোগ্য, কেননা তা হল কথোপকথনের ভাষা ও প্রচলিত ভাষা।

প্রবন্ধের মধ্যে আদর্শ ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন এবং যে সব উদাহরণ দিয়েছেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষার যতখানি মিল প্যারীচাঁদের ভাষার ততখানি মিল নেই। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে যা ছিল আদর্শ ভাষা তা ছিল বিদ্যাসাগরেরই ভাষা, প্যারীচাঁদের নয়। বলা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে আদর্শ ভাষা হিসাবে, সচেতন অসচেতন যেভাবেই হোক, বিদ্যাসাগরকে যতখানি গ্রহণ করেছিলেন প্যারীচাঁদকে ততখানি নয়।

এখন প্রশ্ন, সাহিত্যসমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে কেন বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করতে পারলেন না? মনের মধ্যে বিদ্যাসাগরী রীতিকে সমর্থন ও আদর্শ বলে গ্রহণ করা সত্ত্বেও কেন তিনি সেই ভাষা-রীতিকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করতে পারলেন না? টেকচাঁদের ভাষাকেই বা কেন তিনি এতখানি মূল্য দিয়ে বসলেন? বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের সমালোচনা-রীতিকে যতই 'নিরপেক্ষ সমালোচনা' বলে উল্লেখ করে থাকুন না কেন, তাঁর এই প্রবন্ধে সেই বিচারনিষ্ঠ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাচ্ছি না। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের প্রতি যে যথার্থ সুবিচারের পরিচয় দিতে পারেন নি, সে কথা বর্তমান সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রমথনাথ বিশী 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, এই প্রবন্ধে "বঙ্কিমচন্দ্র নিজের যুক্তির কাছে নিজেই হার মেনেছেন" এবং মন্তব্য করেছেন, "বঙ্কিমের বিচারে যেমনই হোক কালের বিচারে বিদ্যাসাগর নিজের অনুকূলে রায় পেয়েছেন।" 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে

সুকুমার সেন লিখেছেন, "সমসাময়িক শক্তিশালী গদ্যলেখকদিগের মধ্যে অনেকের প্রতিই তিনি অবিচার করিয়া গিয়াছেন।...আলালের ঘরের দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধকরি কতকটা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর—এই দুই মহাপুরুষের সম্পর্ক প্রথম থেকেই পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম পুস্তক ১৮৫৫র জানুঅরিতে প্রকাশিত হয় আর ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর ১৮৫৬এ বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ১৮৭১এ এবং এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৭৩এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগর-বিরোধী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের কিছুদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'বহুবিবাহ' নাম দিয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসেই সূর্যমুখীর কলম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন, "আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

উপন্যাসে যা সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হল প্রবন্ধে তা আরও কঠিনতর ভাষায় ব্যক্ত হল। বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধ পরে বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে সংগৃহীত হয়। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে পত্রিকার প্রকাশকাল দেওয়া আছে। কিন্তু এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থমধ্যে বঙ্কিম কোথাও তার নির্দেশ দিয়ে যান নি। গ্রন্থের মধ্যে এই প্রবন্ধটির সূচনায় বন্ধনীর মধ্যে বঙ্কিম লিখেছেন, "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে

তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচারের জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।"

এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার নির্দেশ বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে না থাকার কারণ এখন বোঝা গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ লেখার উনিশ বছর পরে পরিণত মন নিয়ে যখন রচনাটি পুনরায় নতুন করে বিচার করতে বসলেন তখন সেই প্রবন্ধের অনেক অংশই তাঁর কাছে বর্জনীয় বলে বোধ হয়েছিল। আজ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তাঁদের উভয়ের মনোমালিন্য ক্ষোভবিদ্বেষ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাকে আর চঞ্চল করে তোলে না। দেশের মানুষও আর এসব নিয়ে ছড়া বা কবিতা রচনা করতে বসে না। আজ উত্তেজনার সকল তরঙ্গ শান্ত, বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষ নীরব, ছড়াবাঁধা কবিতার অনেক কবিতাই হয়ত গেছে হারিয়ে।—তবু যা আছে তা ইতিহাস নীরবে তার পুরণো পৃষ্ঠার মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছে।

পুরাতন বঙ্গদর্শনের পাতা উলটোতে উলটোতে দেখা গেল ১২৮০তে, পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় বঙ্কিমের 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত অংশ, যা আজ সম্পূর্ণ-রূপে ইতিহাসের সামগ্রী, অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত সেই রচনাংশ এখানে উদ্ধৃত করি। বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের মধ্যে বিরোধ কিভাবে এবং কতখানি দানা বেঁধে উঠেছিল তা এই উদ্ধৃত অংশ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় উত্তেজিত কলমে লিখেছেন,—

"এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি,

তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মধ্যে যে-কয়েকজন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচজনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই।[১] গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন যে, বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, 'তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।' আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেন না আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল যে, আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব যে, 'মহাশয়েরা কোন্ সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।' আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল, এবং এখনও শ্রেণীবিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে, যে-কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল, যে এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, 'শ্যালা তুই কি জানিস্'—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে! বাঙ্গালি লেখক ও বাঙ্গালি অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই চারি কথার পর পরস্পকে 'পাষণ্ড' 'ব্যালীক' 'নরাধম' বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকেরা

১. 'ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নকে একটু ক্ষমা করিয়া স্পষ্ট বলেন নাই।'

পরস্পর মতভেদ দেখিলে অমনি, ভিন্ন মতাবলম্বীকে 'মূর্খ' 'ধৃষ্ট' 'অসৎ' 'মিথ্যাবাদী' এবং অন্যান্য উচ্চার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্যভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা চিরকাল ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয়া ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার ভাষা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বল ললাটবিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটিমাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈব-নিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসক-দিগের মধ্যে এইরূপ ভাষায় অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটুফুল, ছেঁড়াচুল, এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্রলোকেও দাস হয় উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ রুচির পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই। গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্য নির্ণয় পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের অভক্তি জন্মে মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ দুই-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

'অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।'

পুনশ্চ ৬ পৃষ্ঠায়,—

'ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃষ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।'

তর্কবাচস্পতি যেমন ইচ্ছা তেমন মনুষ্য হউন, সাধারণের তাহাতে ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। তিনি কুলোক হইলেও, বিচার্য বিষয় কেবল এই যে তাঁহার উক্ত কথাগুলি যথার্থ, না অযথার্থ? যদি সেগুলি অযথার্থ হয়, তবে তাঁহার চরিত্রের কথা উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে। আর যদি সে কথাগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ যেমন চরিত্র হউন না কেন, তাহা যথার্থই থাকিবে। রাগ, দ্বেষ এবং অবিমৃষ্যকারিতা বোধহয় পৃথিবীতে এত সুলভ, যে আমরা অন্যের প্রতি তাহার আরোপণ না করিলেই ভাল করিব। এই নৈতিক উক্তির প্রমাণস্বরূপ, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

'যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্বে বঙ্গদেশবাসী অধুনা মুরশিদাবাদ নিবাসী, সর্বশাস্ত্রদর্শী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন মহোদয় যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য করিতে হইবেক ; তাহা হইলে আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই ; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস

পাই নাই। পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া এরূপ গর্বিত বাক্যে, এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিয়াছেন।'

পুনশ্চ, ২৩৯ পৃষ্ঠায়—

'ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ,…এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্বাচীন না হইলে সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।'

এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল যে, বোধহয় সামান্য লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধহয় তেমনই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় সন্ধান করিবেন, আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে উপাখ্যান-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। নেত্ররোগীর উপাখ্যান ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে। যে সকল উপাখ্যান নীতিবিরুদ্ধ, বা অশ্লীল, বা অন্য কারণে ভদ্রের অনাদরণীয়, তাহা কদাচিৎ রসবাহুল্যের অনুরোধে সহা যায়। ধর্মশাস্ত্রের বিচার মধ্যে যদি উপন্যাস ন্যস্ত হইল, তবে তাহা একটু সরস হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক শাশুড়ী কুন্তীর দৃষ্টান্তানুবর্তিনী, তাঁহার বধূ দ্রৌপদীর

দৃষ্টান্তানুকারিণী, এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপি কৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণে নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভৎর্সনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না। কটুবাক্যে আনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতা জ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্বদা দেখা যায়। আমরা তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না, কেননা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষ সিদ্ধি হইতেছে, কদর্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিজ্ঞ, মান্য এবং সুপণ্ডিত লেখকের প্রবৃত্তি তখন বঙ্গীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকের মঙ্গল কামনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন ভবিষ্যৎকালে ভদ্রতা ও সভ্যতা স্থান পাইতে পারে এই বাসনায় ভিন্ন জাতীয়গণের নিকট চিরকাল আমরা ইতরজাতি বলিয়া পরিচিত না থাকি, এই ইচ্ছায়, আমরা এই কুপ্রথার নিন্দা করিলাম। আমাদিগের এই বিশেষ আশঙ্কা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লেখকের আদর্শ-স্বরূপ, তাঁহারা এ নজির দেখিয়া অপরিমিত রসিকতা উদ্গীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই আশঙ্কাতেই আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ যে বাক্য উপদেশ বাক্যের ন্যায় শোনায়, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতে আমাদের লজ্জা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সদনুষ্ঠানপ্রিয়তা গুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যাহাদিগকে তিনি কটু কথা বলিয়াছেন—তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা গঙ্গাধর রায় কবিরাজ, ইহাদিগকে আমরা চিনি না; তাঁহাদিগের পক্ষতাবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি দোষারোপ করিব এমত কোন কারণই নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তকের উত্তরে ইহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের লিপিপ্রণালীরও প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এ সকল কথা বলিতে

হইল। বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্রলেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য-ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাঁহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই মূল প্রবন্ধটি পরিবর্জিত আকারে ১৮৯২এর ২৫ মে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরই ঠিক দু মাস পরে ২৭ জুলাই কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরের বহু-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ আবার জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন, "শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই।" পত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত বিবিধ খণ্ডে সংকলিত।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় একটি রচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম 'তুলনায় সমালোচনা'। লেখক যিনিই হন, লেখাটি যে সম্পাদকের অনুমোদনের ফলেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে তা বলা অনাবশ্যক। প্রবন্ধকার লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু আনি সিকি আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে Queen Victoria ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়; বর্ণ-পরিচয় দু আনি, ক্ষুদ্র, বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টামহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান, সেই খোট্টার রূপায়

টাকা প্রস্তুত করান ; সে টাকার নাম 'বেতাল পঁচিশ' ; সেবার চেম্বরস্ বলে একজন বিলাতি মহাজনের নিকট রূপা লইয়া 'জীবন চরিত' নাম দিয়া একটু কম খাদ মিশাইয়া ক হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে খাঁটি রূপা রাখিয়া যান ; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই 'সীতার বনবাস' নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের 'ধোঁকার মজা' বলে খানিক রূপা ছিল তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া 'ভ্রান্তিবিলাস' টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন।"[১]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন, 'He is only primer maker'—তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন বই তো নয়।"

এরকম কথা বঙ্কিম তাঁর Bengali Literature প্রবন্ধেও ব্যক্ত করেছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "There are few Bengalis now living who have a greater claim to our respect than Pundit Iswar Chandra Vidyasagar. His exertions in the cause of Hindu

১. এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন তা একবার দেখা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন, "প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক ; 'জলধর' 'জগদম্বা' 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত।

বাঙ্গালি-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি ? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না, জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন-গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিদ্ ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয় ?"

widows, the noble courage with which he, a pundit and a professor, first advocated their cause, the patient research and indefatigable industry with which he sought to maintain it, his large-hearted benevolence, and his labours in the cause of vernacular education—all these things combine to place him in the front rank of the benefactors of his country. His claims to the respect and gratirude of his countrymen are many and great, but high literary excellence is certainly not among them. He has a great literary reputation; so had Iswar Chandra Gupta: but both reputations are undeserved, and that of Vidysagar scarcely less so than that of Gupta. If successful translations from other languages constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar's case; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius; and beyond translating Vidyasagar has done nothing."

'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'উত্তরচরিত', নামক প্রবন্ধের একস্থানে ভবভূতির রামের অসংযত বিলাপ এবং করুণরসের বাড়াবাড়িকে নিন্দা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রণীত 'সীতার বনবাস'কে আক্রমণ করেন। 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ইহার অনেকগুলির কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠ-

কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এরূপ করিয়া কাঁদে বটে।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে কেউ মনে করবেন না। কারণ আমরা দেখেছি বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে ভবভূতির অসংযত আবেগকে এবং করুণরসের মত্ত প্রবাহকে অনেক পরিমাণে সংযত করতে চেয়েছিলেন। পরিসরের দিক থেকেও তাঁর রামের বিলাপ ভবভূতির থেকে সংক্ষিপ্ত।

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনা-মূলক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালে এই প্রবন্ধের মধ্যেও এমন কিছু অংশ ছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জন করেন। গ্রন্থে যেখান থেকে প্রবন্ধ আরম্ভ হয়েছে তার পূর্বে আরও কয়েকটি ছত্র বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত সাহিত্যিক মন এই সকল অংশ আদর্শ সাহিত্যসমালোচনার পক্ষে রুচিহীন ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে সম্ভবতঃ বর্জন করেন। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলেন, "আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ্য কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না।" পরিশেষে 'যদুবাবু' 'মাধুবাবু' ইত্যাদির সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে এক-গোত্রে ফেলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের যে মন্তব্য তা "অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ।" বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত এই অংশ বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৭৯র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পাওয়া যাবে।

আমরা জানি বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ বঙ্গাব্দে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে আছে, "বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধহয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র কবিতা

গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষা'।"

বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১২৮০ বৈশাখ) ভারতচন্দ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে একস্থানে লিখেছে, "যেখানে দেখিবেন 'চাই বেলফুলের' ডাক অধিক সেইখানেই দেখিবেন যে এখন ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোক ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনই পাঠ করিবে না? উত্তর, কেন ভদ্রলোকে কি ফুলের আদর জানে না? না ফুলব্যবসায়ী ভদ্রপল্লীতে থাকে না? তবে কিনা ভদ্রলোকে যদি মালিনী গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন, বা কবি ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিবর জ্ঞান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। বরং কখনও কখনও তাহাতেই তাঁহাদের স্বভাবদোষ অনুমেয় হইয়া উঠে।"

'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের আর একস্থানে লেখা আছে, "জানি, শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের ভাষা অথবা জীবনের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও সহ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' ভারতচন্দ্রের ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন 'beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing' এবং টেকচাঁদি ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম প্রসঙ্গে কি অভিমত পোষণ করেন জানতে ইচ্ছে করে। 'চারিত্রপূজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যতই primer-maker বলে লঘু করতে চেষ্টা করুন, মনে রাখতে হবে বঙ্কিম তাঁর নিজের রচনায় বিদ্যাসাগরী ভাষারীতিকেই মূলতঃ গ্রহণ করেছিলেন, টেকচাঁদি ভাষাকে নয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত, "one of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither

characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutam—one of the best masters, we say, of Bengali style is Babu Bhudeb Mukerji." এখানে দেখা যাচ্ছে গদ্যরীতির দিক থেকে টেকচাঁদ ও হুতোম একই শ্রেণীভুক্ত। এই উভয় লেখকের গদ্যরচনাই একই বিশেষণে বিশেষিত। অথচ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যে দিন থেকে টেকচাঁদি ভাষার সূচনা 'সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি' এবং 'হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।'

মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোন আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে না। বঙ্গদর্শনে 'মানসবিকাশ' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদনের কথা উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক মাইকেলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন একটি ক্ষুদ্র রচনায়। 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'কে বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অন্যতম বলে উল্লেখ করেন। এইরকম দুই একটি ক্ষুদ্র-বিচ্ছিন্ন মন্তব্য ছাড়া মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন স্বতন্ত্র আলোচনা নেই। এইদিক থেকে লক্ষ্য করলে Bengali Literature প্রবন্ধে মাইকেল সম্পর্কে বঙ্কিমের সমালোচনাটি অতি মূল্যবান। এই নিবন্ধে লেখক মাইকেলের কবিতা ও নাটক উভয় রচনাধারা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন।

সেযুগে মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে নানা সমালোচনা হয়। কেউ তাঁকে কালিদাসের সমগোত্রীয় বলেছেন আবার কেউ তাঁকে একজন সামান্য কবি ছাড়া কিছুই বলতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "For ourselves we agree with neither, and while admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great poets. He has incurred much hostile criticism by his innovations in language, and by his introduction into Bengali of the use of blank verse, but his rightful place in Bengali literature is perhaps the highest." অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মধুসূদন, কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় একজন মহান কবি নন, কিন্তু বাংলা কাব্যজগতে তিনি উচ্চতম আসনের অধিকারী।

মহাকাব্য হিসাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' উভয় গ্রন্থেরই আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সমালোচকের মতে 'মেঘনাদবধ'ই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। 'তিলোত্তমাসম্ভব' 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় মহাকাব্য বটে, কিন্তু মূল্যবিচারে 'মেঘনাদবধ' অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মূল রামায়ণ থেকে কাহিনী গ্রহণ করা হলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের একপ্রকার মৌলিক সৃষ্টি। বঙ্কিমের ভাষায়, "The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creation." বাল্মীকি ব্যতীত হোমার বা মিলটনের কাছেও যে মধুসূদন ঋণ গ্রহণ করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন এবং সে প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, মধুসূদনের রচনায় কোথাও অনুকরণের স্থূলতা নেই, সবকিছুকেই কবি স্বীকরণ করে নিতে চেষ্টা করেছেন। সব মিলিয়ে 'মেঘনাদবধ' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য মূল্যবান সৃষ্টি বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থে মধুসূদন নানাদিকে কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। "The machinery, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is graceful and tender and terrible in turn. The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express." কিন্তু এখানেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা সম্পূর্ণ নয়। অতঃপর বঙ্কিম এই গ্রন্থের কিছু কিছু ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন।

"Mr. Datta, however, is not faultless. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff, clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind ; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthy of Mr. Datta's genius and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they

almost nauseate his readers. Nor is he altogether innocent of plagiarism. Homer and Valmiki are not unfrequently put under contribution, and Milton and Kalidas have equal reason to complain. Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction in imitation of the English idiom of such verbs as *stutila swanila nirghosila*."

'বীরাঙ্গনা কাব্য' বঙ্কিম-সমালোচনায় উচ্চ প্রশংসিত হয়। 'মেঘনাদ বধে'র ন্যায় এই কাব্যেও অত্যুজ্জ্বল কল্পনা, সমৃদ্ধ কাব্যিক শব্দসম্ভার এবং বিবিধ গীতিময় নিয়ন্ত্রিত ছন্দস্পন্দন লক্ষিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কথা বঙ্কিম তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, তবে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি।

মনে হয়, মধুসূদনের কাব্য অপেক্ষা কাব্যকলার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মধুসূদনের সনেট বা চতুর্দশপদী বঙ্কিমের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করতে পারে নি। "Of his sonnets we are no great admirers, though they might serve to win a name for a less distinguished author."—মাইকেলের সনেট সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট অভিমতটি হল এই।

বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর Bengali Literature প্রবন্ধে কেবল মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কথা আলোচনা করেছেন। বাংলা নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলেছেন, "No Bengali writer has yet shown any real dramatic power." এর পরেও বঙ্কিমচন্দ্র যদি বলেন দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, তাহলে বুঝতে হবে এই যে, যে-সকল বাঙালী নাটকরচনার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কেউই যথার্থ নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি, তথাপি এই রচয়িতাদের মধ্যে যদি কাউকে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করতে হয় তবে তিনি দীনবন্ধু মিত্র। নাট্যকার হিসাবে মধুসূদনের সাফল্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন নি। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' —কোনটি উচ্চমর্যাদালাভের অধিকারী বলে সমালোচক মনে করেন না। বরংচ প্রহসন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন এবং

'একেই কি বলে সভ্যতা' গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর ভূমিকারূপে বঙ্কিমচন্দ্র 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক নিবন্ধটি লেখেন। এই নিবন্ধে বঙ্কিম একস্থানে বলেছেন, "নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী।...কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট।"—এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের, অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই Bengali Literature প্রবন্ধে 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে বলেছেন, "We should give it a very low place as a work of art. The importance was political, not literary." 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে দুই বিপরীত অভিমত এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একস্থানে বঙ্কিম বলছেন 'নীলদর্পণ' কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, আর একস্থানে তিনি বলছেন কাব্যমূল্য বিচারে সে অতি নিম্নস্থানাধিকারী। দেখা যাচ্ছে, পনের বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থটিকে বঙ্কিম নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন, পনের বৎসর পর সেই রচনাটিকেই তিনি সর্বাধিক শক্তিশালী রচনা হিসাবে অভিনন্দিত করলেন। এরকম স্ববিরোধী মতামত সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যে বেশি চোখে পড়ে না।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল, Bengali Literature প্রবন্ধের সর্বশেষে 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে'র কথাও আলোচিত হয়েছে। সে সময় বঙ্কিমের তিনটি মাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী। এই উপন্যাস তিনটিকে বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিবন্ধে বঙ্কিম কেবল 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীটি মাত্র সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন। কাহিনীর শেষ অংশের বিবরণ, "The Kapalika [at] length dragged Naba Kumar to land, but Kapal Kundala was seen or heard of no more." বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কপালকুণ্ডলার এই উপসংহারভাগ পরিবর্তিত করেন।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাময়িকসাহিত্য সমালোচনা

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত বিবিধ সমালোচন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।" বিবিধ সমালোচন গ্রন্থ প্রকাশের তিন বৎসর পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্ধ পুস্তক, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং ১৮৯২এ বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন পুস্তকেই আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার অংশ সংকলিত হয় নি। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সম্পূর্ণ রচনাবলী বা গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এই সকল রচনা সংযোজিত হয়নি। অদ্যাবধি অনাহৃত এই রচনাগুলির মধ্য থেকে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নূতনতর দিক উদ্ঘাটিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' ও 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ তিনটি যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সুদীর্ঘ সমালোচনার অংশ মাত্র, এবং অবশিষ্ট রচনাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্লভ রচনা হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য—এ বিষয়ে আমরা অবহিত হই নি।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার অংশ, 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' গ্রন্থের সমালোচনার অংশ এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ দীনেশচরণ বসুর লেখা 'মানসবিকাশ' নামক কাব্যের সমালোচনার অংশ। বঙ্গদর্শনে তিনটি সমালোচনাই যথাক্রমে 'অবকাশরঞ্জিনী' 'দানবদলন কাব্য' ও 'মানসবিকাশ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে আরও তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন তা আমরা জানি! সেগুলি হল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্র-সংহার' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্য এবং নবীনচন্দ্র

সেনের 'পলাশির যুদ্ধ'। রচনাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীতে এবং আরও পরে যোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা-সংবলিত সাহিত্য সংসদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে। এই রচনা-তিনটির সম্পূর্ণ অংশ কোন গ্রন্থাবলীতেই প্রকাশিত হয় নি। সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণের সম্পাদক রচনাগুলির অংশবিশেষ মাত্র মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু মূল রচনার যে নির্বাচিত অংশমাত্র মুদ্রিত হল, এই নির্বাচিত অংশই যে সম্পূর্ণ রচনা নয়, তা গ্রন্থাবলীতে কোথাও নির্দেশিত হয় নি। পরবর্তীকালে সাহিত্য সংসদ্ যে রচনাবলী প্রকাশ করলেন, তাতে কেবল সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে মাত্র।

সুতরাং আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণবিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় তাঁর গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে নেই, সে পরিচয় রয়েছে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অধুনা বিস্মৃত কয়েকটি মূল্যবান সমালোচনা-নিবন্ধের মধ্যে। সমালোচনাগুলি যে যে শিরোনামে এবং পত্রিকার যে সকল সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল তা নিম্নে বিবৃত হল।

অবকাশরঞ্জিনী / বৈশাখ ১২৮০, দানবদলন কাব্য / জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, মানস-বিকাশ / পৌষ ১২৮০, বৃত্রসংহার / মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, ঋতুবর্ণন / বৈশাখ ১২৮২ এবং পলাশির যুদ্ধ / কার্তিক ১২৮২।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে 'অবকাশ-রঞ্জিনীই' বোধহয় প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনার সম্মানলাভ করে। সে সমালোচনাও স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর রচিত। তখন আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।" আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী' পুস্তকেরই প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এদিক থেকে নবীনচন্দ্র সত্যই গৌরবলাভের অধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "অবকাশরঞ্জিনী কতকগুলি খণ্ডবাক্যের সংগ্রহ। ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধ রুচি; তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। ভরসা করি পুনর্মুদ্রণ কালে আপনার পরিচয় দিবেন।"

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এটিই নবীনচন্দ্রের প্রথম

কাব্যগ্রন্থ। কাব্যে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যপাঠ করে কবি-সম্পর্কে যে আশা প্রকাশ করেছিলেন তা ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল বলা যায়।

'অবকাশরঞ্জিনী' ও তার কবি-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও যা ব্যাখ্যা করেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"যে সকল মোহিনী স্বষ্টির গুণে কবিগণ চিরস্মরণীয় হয়েন, অবকাশ-রঞ্জিনীতে তাহার কিছু নাই। এবং থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অপিতু কোন রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে সকল স্বষ্টি বা অবতারণায় সক্ষম যে সকল মহাত্মা, তাঁহারা এ জগতে অতি দুর্লভ। সে সকল গুণ না থাকিলেও অবকাশরঞ্জিনীর কবিকে স্থকবি বলা যায়। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দচতুর। কতকগুলা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দচতুর বলি না ; অথবা যিনি শ্রুতিমধুর শব্দপ্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণপথে আইসে। এই কবির সেই শব্দ প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলিন আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাই উজ্জলতাবিশিষ্ট করেন। অবকাশরঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা ছন্দের পারিপাট্য হেতু নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

সখিরে! কি কব করম কথা!

প্রণয় ভাবিয়া পাষাণ হৃদয়ে

চাপিয়া পাইনু ব্যথা।

কুসুম কলিকা, জিনিয়া বালিকা,

ছিলাম যখন সই,

প্রণয় কেমন, জানি নাই আমি

শৈশব আমোদ বই।

মধুকর ভ্রমে, বিকাশিনু দল,

ভাসিয়া যৌবন জলে,

নিদারুণ কীট পশিয়া মরমে,

শুকাল বিকচ দলে।

সখি! যায় প্রাণ যায়, দংশন জ্বালায়,
বাঁচিনে পরাণে আর,
জীবন মৃণাল, এই ছুরিকায়,
কাটিব করেছি সার॥

অল্পবয়স্ক কবিগণ, বিনানুকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অনুকরণপ্রিয় হয়েন। অবকাশরঞ্জিনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে স্মরণ হইবে।

ছিলে তুমি অয়ি গঙ্গে! হিমাচল শিরে,
তরল রজতাসনে রাজরানী প্রায়
ভূতলে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে,
কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায়!
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,
কাতরে কাঁদিছে আহা! নগেন্দ্র নন্দিনী।

নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির ন্যায় রচনা পাঠ করিয়া হেমবাবুকে স্মরণ হয়, এবং উভয়ের আদর্শ বাইরণকেও মনে পড়ে;

নাচরে ময়না নাচরে আবার,
দুই (দিই ?) করতালি নাচ আর বার,
চন্দ্রানন হতে ঢাল একবার,
ঢালরে সঙ্গীত অমৃতের ধার,
কি কটাক্ষ! হলো জেনেছি এবার,
কাশী নরেশের হৃদয় বিদার।

আমরা এমত বলিতেছি না যে এই কবি অন্য লেখকের নিকট ঋণী। পশ্চাদ্বর্তী লেখকগণকে পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণী হইতেই হয়। সেই পরিমাণের অতিরেকে ইনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইনি নিজমানসপ্রসূত কবিত্বরত্ন যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে পরের নিকট ঋণী বলিলে অন্যায় নিন্দা করা হয়।”

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' প্রকাশিত হয়। বৈশাখে 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনা লিখে পরের মাসেই বঙ্কিম 'দানবদলন কাব্যে'র সমালোচনা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীন কবি। নবীন কবি হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ কাব্যে বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া অসং সাহসের কাজ বটে। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতিমানুষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। এক পক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শাস্তা অসুরকুল, পক্ষান্তরে সর্বনাশিনী মূর্তিবিশিষ্টা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। কাব্যপ্রণয়নে বিশেষ কৌশলবিশিষ্ট কবিভিন্ন ইহাতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, নবীন কবি রামচন্দ্রবাবু ইহাতে অনেক দূর কৃতকার্য হইয়াছেন। যে কৌশলে প্রাচীন কবিরা, দৈবচরিত্র মনুষ্যের সহৃদয়তাস্পদ করিয়াছেন, ইনিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রথানুসারে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। অসুরগণকে মানবপ্রকৃত করিয়া উপাখ্যানের মনোহারিতা সম্পাদন করা যে কৌশল, অনেক কাল হইল পৌরাণিকেরা তাহার উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কবি প্রথমে চণ্ডীর উগ্রচণ্ডা মূর্তিকে মানব-মূর্তি সদৃশী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবলমাত্র অতিপ্রকৃত বলবীর্যের আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে, তাঁহাকে মানবপ্রকৃতিশালিনী করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখকের বর্ণনাশক্তি, শব্দচাতুর্য ও উপমাপ্রয়োগের প্রশংসা করেছেন।

কবি রামচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, "তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দঃ রামচন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।

এই কবির ভাষা কোন কোন সময়ে কর্কশ বোধ হয়, কিন্তু সেটি আমাদের সংস্কারের দোষ হইলেও হইতে পারে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষাটি আর একটু পরিষ্কার করিলে ভাল হয়।"

সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার সকল স্থান সমান নহে—অনেক দোষও

আছে—বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্বশক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকৃতি ইহাকে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি দিয়াছেন; কাল সহকারে এবং শিক্ষা এবং অভ্যাসের সাহায্যে ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

দীনেশচরণ বসুর 'মানসবিকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'মানসবিকাশ' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অতঃপর লেখক একাধিক কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন। 'মানসবিকাশ'এর আখ্যাপত্রে কবির নাম ছিল না। তাই বঙ্কিমের সমালোচনাতেও কবির নাম নেই। এই কাব্যগ্রন্থটি যে দীনেশচরণের রচনা তার একটি প্রমাণ হল কবির 'মহাপ্রস্থান কাব্য'র আখ্যাপত্রে "'মানসবিকাশ', 'কবি-কাহিনী' ও 'কুলকলঙ্কিনী' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত" এরূপ মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও 'মানসবিকাশে'র গ্রন্থকার হিসাবে দীনেশচরণের নাম আছে।

'মানসবিকাশ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা, "আমরা মানসবিকাশ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—'মিলন' ও 'কাল' নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। 'কাল' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়,
নরনারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল শোভিত
হলো উদয়।
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥
দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারও নাহিক নিস্তার,

ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ
দুঃখ নীরে কর নিমগন,
পদযুগ পরে কর রে দলন,
আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কত শত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়ন জলে।

এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি ইংরেজি গন্ধ কয়। প্রাচীন বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকেরা এ পথে যাইতেন না; কালের কথা গাহিতে গেলে, সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্য জাতির নয়নজল তাঁহাদিগের মনে পড়িত না; এ সকল জ্ঞান ও বুদ্ধিবিস্তৃতির ফল। প্রাচীন কবি, কালের গতি ভাবিতে গেলে, আপনার হৃদয়ই ভাবিতেন; নিজ হৃদয়ে কালের 'দুরন্ত দংশন' কি প্রকার, তাহার বিষ কেমন, তাহাই দেখিতেন। কাল সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কবিতা তুলনার জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

এখন তখন করি, দিবস গোয়াঙনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোয়াঙনু
খোয়নু এ তনুয়াক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোয়াঙনু
খোয়াঙনু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবি মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে তনু যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, ইত্যাদি।

[কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি, ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।][1]

ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপে ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক এবং মানসবিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাঁহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি কোন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন দোষই নাই।

মানসবিকাশের কবিতার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা 'মিলন', কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না। তাহা

১. এই অংশটি 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে গৃহীত হয়েছে। তবে সেখানে আছে, "ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth."

কর্তব্য নহে এবং তদপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। এজন্য 'প্রেম প্রতিমা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

আইল বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়,
তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়।···

ইংরেজ শিষ্য, এইরূপে প্রেমবর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠিধারী বৈরাগিগণ-কৃত প্রেমবর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্বে আর একজন হাফ ইংরেজ হাফ জয়দেব চেলার কৃত কবিতা শুনুন ; এ কবিতারও উদ্দেশ্য প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা।

মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে
কমল কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, ডুবিয়া থাকিবে জলে,
বঞ্চিয়া রমণে।
যে যাহারে ভালোবাসে, সে যাইবে তারপাশে
মদন রাজার বিধি, লঙ্ঘিব কেমনে।
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে, এ তিন ভুবনে॥

এক্ষণে বৈষ্ণবের দলের দুই একটি গীত—

সই, কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম॥···
—জ্ঞানদাস

পুনশ্চ,

সোই পীরিতি পিয়া সে জানে।

যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছনি দিনে পরাণে ॥...
—রায়শেখর

পরিশেষে আমাদের গীতকাব্যের আদিপুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক—তাঁহার কবিতায় রস বড় গাঢ়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি—তত গাঢ় রস বঙ্গদর্শনের পাঠকদিগের সহিবে না। তবে যাত্রাকরদিগের কৃপায়, অনেকেই তাঁহার দুই একটি গীত, বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন—

প্রথম, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতি ভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায়শেখরে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সঙ্কীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী।

তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতায়, সেই গতি পরিসর পথবর্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই, নদীর স্রোতের ন্যায়, বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে, বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে।

চতুর্থ, মানসবিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে। 'মানসবিকাশ' অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদ্য-বিন্যাসশক্তি প্রশংসনীয়। 'মিলন' নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর যে, তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার উপসংহারে চার শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে দেখা গিয়েছে সমালোচক বাংলা গীতিকাব্যে তিন শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছেন। এক শ্রেণীর কবির কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, আর এক শ্রেণীর কবির রচনায় অন্তঃপ্রকৃতির প্রাধান্য এবং তৃতীয়

শ্রেণীর কবি অর্থাৎ আধুনিক গীতিকাব্য লেখকগণের কবিতায় ইতিহাস বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন অন্তঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত চিত্রিত করতে না পারলে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ ঘটে, এবং যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত চিত্রিত করতে সক্ষম না হলে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মায়। 'মানসবিকাশে'র সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব এবং আধ্যাত্মিকতা দোষের নিদর্শন 'মানসবিকাশে'র কাব্যকার। উভয় প্রকৃতিকে যিনি সহচরীরূপে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই সুকবি। বঙ্কিমের অভিমত, এই শ্রেণীর কবির উদাহরণ জ্ঞানদাস ও রায়শেখর। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বা দীনেশচরণ কেউই জ্ঞানদাস বা রায়শেখরের তুলনায় সুকবি নন। এর প্রধান কারণ এঁরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে ইংরেজি-কবিসম্প্রদায়ের শিষ্য। তার ফলে সকলের কাব্যেই কম বেশি আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মেছে। এঁদের চিন্তা ও বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিনী বলে এঁদের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হয়েছে, এবং এই বিস্তৃতিগুণের কারণে প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হয়েছে। জ্ঞানদাস বা রায়শেখর কোন ইংরেজ কবির শিষ্য নন, তাই তাঁদের কবিতা বহুবিষয়িনী বা দূরসম্বন্ধগ্রাহিনী নয়, এবং তাই কবিতা অতি প্রগাঢ়; মধুসূদন-প্রমুখ আধুনিক কবির কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র বলেই কবিত্ব সেরূপ প্রগাঢ় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তাঁর সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র অনেক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা দোষমুক্ত এবং সুকবি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র যে-পরিমাণ সুকবি 'অবকাশরঞ্জিনী'র লেখক নবীনচন্দ্র ও 'মানসবিকাশে'র লেখক দীনেশচরণ সে পরিমাণে সুকবি নন—কারণ এঁদের রচনায় আধ্যাত্মিকতা দোষ অতি প্রবল। 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে আরও কি কি ত্রুটি রয়েছে তা বঙ্কিম উক্ত গ্রন্থের সমালোচনায় ব্যক্ত করেছেন, 'মানসবিকাশে'ও প্রগাঢ়তা গুণের অভাব ঘটেছে। তথাপি কাব্যদুটি নিকৃষ্ট নয়, বরং নানা কারণে প্রশংসার যোগ্য বলে সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১২৮১র মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় 'বৃত্রসংহার' কাব্য সমালোচিত হলেও এর পূর্বেই যে হেমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন এবং হেমচন্দ্রকে যে

একজন উৎকৃষ্ট কবি হিসাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন—সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। শুধু যে 'অবকাশরঞ্জিনী' বা 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে তাই নয়, ১২৮০র ভাদ্র সংখ্যায় 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে অতিরিক্ত সংযোজন অংশে বঙ্কিম-স্বাক্ষরিত যে মন্তব্য আছে তাও লক্ষনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা, "কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গ-কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের এই মন্তব্যের সঙ্গে একালের পাঠক পরিচিত নন। অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক বা তাঁর গ্রন্থাবলীতে অদ্যাবধি অমুদ্রিতই রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ উক্তি করেন তখনও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য প্রকাশিত হয়নি। তবে ১২৮০ বঙ্গাব্দের পূর্বেই হেমচন্দ্র-লিখিত 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'কবিতাবলী' (১৮৭০) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন।

'বৃত্রসংহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুঅরি, ১২৮১ বঙ্গাব্দে। 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭এর ১৫ সেপ্টেম্বর, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ প্রায় তিন বৎসর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নন। নবীনচন্দ্রের উক্তি ('আমার জীবন' গ্রন্থে), বঙ্গদর্শনে 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাটি সঞ্জীবচন্দ্র-কৃত। সুতরাং বঙ্কিম-কৃত প্রথম খণ্ডের সমালোচনাটিই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত, দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাটি নয়।

প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে, "হেমবাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্বাচন সাধ্য নহে; অর্ধনির্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা

বা কাণ্ডমাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্বদা জন্মে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এ সমালোচনা, ঠিক সমালোচনা নয়—একপ্রকার গ্রন্থের পরিচয়দান মাত্র। সেকথা সমালোচক নিজেও স্বীকার করেছেন।

'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডে একাদশটি সর্গ ছিল। বঙ্কিম এই একাদশটি সর্গেরই বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয়দানের ফলে কাব্যের শ্রেষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে পাঠক সহজেই পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। মূল কাব্যের রসও পাঠক নানা স্থানে আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছেন। কারণ বঙ্কিম তাঁর সমালোচনায় কাব্যের বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যানভাগ, নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র এবং কাব্যের নিগূঢ় মর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তুলিতে সক্ষম হইতাম না; গ্রন্থকার যে অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।" উদ্ধৃতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্লেষণ এবং মধ্যে মধ্যে যে মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। বঙ্কিমের কোন কোন মন্তব্য তো সে যুগে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় সর্গ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—

'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য-মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।" 'বৃত্রসংহারে'র এতখানি প্রশংসায় সে যুগে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, "ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে।

দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধবর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধবর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য।"

ষষ্ঠ সর্গের পর সপ্তম সর্গ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "কাব্য-নায়ক ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে দৃশ্যমান হইতেছেন। কোন কোন মহাকাব্যে আদ্যোপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন না,—সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রধান উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোন কোন মহাকাব্যে নায়ক, তাদৃশ সর্বদা দর্শনীয় নহেন; কার্যকালেই দেখা দেন। সংসারের এক একটি কার্য বহুজনের বহুতর উদ্যোগের ফল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্যোগ করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন প্রথমে দেখাইয়া, শক্তিধরের শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এইজন্য শ্রেণীবিশেষের মহাকাব্যে নায়ক কেবল ফলোৎপত্তিকালেই পরিদৃশ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের পর, আট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই; এবং বৃত্রসংহারে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত ইন্দ্রের দেখা নাই।" এখানে 'বৃত্রসংহারে'র সঙ্গে 'ইলিয়ডে'র তুলনা লক্ষনীয়। ইতিপূর্বে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র বর্ণিত নিয়তির স্বরূপ কি, গ্রীসীয় নিয়তি ও হেমচন্দ্রের নিয়তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়, কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞান কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, 'বৃত্রসংহারে' তার উদাহরণ কোথায়—ইত্যাদি প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার উপসংহারে হেমচন্দ্রের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমালোচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করি—

"গ্রন্থকারের ছন্দঃ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন।

হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বৈচিত্র্য ও লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজিরীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগপূর্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, 'কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল' হইয়াছেন। কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দঃ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু 'একোহি দোষোগুণসন্নিপাতোনিমজ্জতীত্যাদি।' আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।" এইখানে 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা শেষ হয়েছে।

'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন হেমচন্দ্র নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। হেমচন্দ্রের ভূমিকার চরণ বঙ্কিম তাঁর সমালোচনায় উদ্ধৃত করেছেন। ভূমিকায় হেমচন্দ্র কি লিখেছিলেন তা প্রথমে জানা প্রয়োজন। কবির বক্তব্য, "নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দেঃ পদ্যবিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই।

তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিলটন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎ পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘুগুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি।" হেমচন্দ্রের এই ভূমিকাংশ পাঠের পর কাব্যের মধ্যে কোথায় কি উদ্দেশ্যে কিরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে জানা গেল। এখন প্রথমে হেমচন্দ্রের বক্তব্যকে সম্মুখে রেখে বঙ্কিমের অভিমত বিচার করা যাক।

হেমচন্দ্রের মূল বক্তব্য হল :

ক. পয়ারাদি বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. মিত্রাক্ষর ছন্দ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ উভয়বিধ ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে বটে, কিন্তু সেখানে সাধারণ সংস্কৃত চার চরণ শ্লোকের রীতি অনুসারে চৌদ্দ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তি চার পংক্তিতে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এবার বঙ্কিমের বক্তব্য সূত্রাকারে নির্দেশিত হল :

ক. একটি দীর্ঘ কাব্য বা মহাকাব্য আগাগোড়া একই ছন্দে লিখিত হওয়া কুপ্রথা। সর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তনের যে রীতি এ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমান—তা শ্রেয়।

খ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংস্কৃত শ্লোকের আকারে রচিত হওয়ায় ভাল হয়েছে।

গ. সংস্কৃত ছন্দের মাত্রাবৃত্ত রীতি পরিত্যাগ করাতে হেমচন্দ্রের পদ্যের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নি। অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ শ্রেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের গৌরব নির্দেশ করেন। কিন্তু আধুনিককালের পাঠক মহাকাব্যের মধ্যে ছন্দপ্রয়োগে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের দুর্বলতা ও ত্রুটি কোথায় তা সহজেই অনুভব করেছেন। হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যেও একাধিক ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখি। মহাকাব্যের মধ্যে নানা ছন্দের ব্যবহার করতে গিয়ে হেমচন্দ্র

মহাকাব্যের গম্ভীর পরিবেশ অত্যন্ত লঘু করে ফেলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ ধ্বনিনির্ঘোষ ও বৈশিষ্ট্য তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। কেবল পয়ারের মিলটুকু তুলে দিয়ে হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। মোহিতলাল রসিকতা করে হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে 'মালগাড়ির ছন্দ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষরের দুর্বলতা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন নি। এবং একাধিক ছন্দ প্রয়োগের ফলে বৃত্রসংহার কাব্যটির যে ক্ষতিই হয়েছে—এ দিকটিও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক লক্ষ্য করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বাংলা কবিতায় সহজেই ব্যবহার করা যায়। হেমচন্দ্রের বক্তব্য, বাংলায় লঘু-গুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় অনুকরণ করা কঠিন। হেমচন্দ্রের বক্তব্যই যথার্থ। এ প্রসঙ্গে 'ছন্দ' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বলেছেন, কোন কোন কবি "বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তু চেষ্টা যে পরিমাণই হোক, বাংলার পক্ষে এ রীতি স্বাভাবিক নয় এবং তা চলতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের অভিমত "বাংলায় এ জিনিস চলিবে না ; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে।" বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেউ কেউ, ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে আরও কোন কোন কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা নিতান্তই চেষ্টামাত্র।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এঁর পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্রের লেখা 'পিতাপুত্র' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পিতাপুত্রের কিরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল তার বিবরণ আছে। অক্ষয় সরকার এখানে জানিয়েছেন, "৮২ সালের [১২৮২] বৈশাখে বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে ঋতুবর্ণনের সমালোচনা করিলেন।"

'ঋতুবর্ণনে'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হেমচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন।

কাব্যের দুই উদ্দেশ্য—বর্ণন ও শোধন।

এক শ্রেণীর কবি, জগৎ যেমন আছে, ঠিক তার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করে থাকেন।

আর এক শ্রেণী, প্রকৃতি সংশোধন করে সৌন্দর্য সৃজন করেন।

বঙ্কিমের ভাষায়, "যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।"

"সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই' সেই আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করে" যে শ্রেণীর কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'। "যাহার উদ্দেশ্য কেবল যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তার "উৎকৃষ্ট উদাহরণ—বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন।" এক্ষেত্রে 'উৎকৃষ্ট উদাহরণ' শব্দটি কাব্যের কতখানি উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করছে তা সহজেই অনুমেয়। বঙ্কিমচন্দ্র একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন হেমচন্দ্র ও গঙ্গাচরণের কাব্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। "উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণবাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ উৎকৃষ্টরূপে আত্মকার্য সম্পন্ন করে, যথা—

ঘনতম ঘোরতট ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারিছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই—তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দক নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ—

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোরঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাবে,

বেগে দীপ্ত গিরি কায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লসিত ভাবে ॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে ॥"

'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন, "হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী।"

সমালোচ্য লেখকের সঙ্গে দেশী বা বিদেশী কোন লেখকের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার একটি বিশেষ প্রবণতা। 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় মধুসূদন হেমচন্দ্র ও বায়রনের প্রসঙ্গ উঠেছে, 'দানবদলনে'র সমালোচনায় মধুসূদনের কথা আছে, 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র জ্ঞানদাস রায়শেখর মধুসূদন হেমচন্দ্র এবং পোপ জনসন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রসঙ্গ এসেছে, 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনায় 'ইলিয়ড' কাব্যের প্রসঙ্গ বা ভারতচন্দ্র মধুসূদন ও বলদেব পালিতের কথা আছে। গঙ্গাচরণ সরকারের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেও ইংরেজ কবির কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছে। বঙ্কিম লিখেছেন, "গঙ্গাচরণবাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাবকে (Crabbe) মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনাকাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।" বঙ্কিমচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় গীতিকাব্য কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং সেখানে কাব্যের বর্ণন ও শোধন এইরূপ কোন বিভাগ করেন নি। উক্ত সমালোচনায় বঙ্কিম, বাংলায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা, ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী',

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঙ্গিনী'র নাম করেছেন। উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলেন নি। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদিগের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না।" ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য, "তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয়, তাঁহার কবিতায় নাই।" এ হেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের সমগোত্রীয়তা আবিষ্কারে গঙ্গাচরণের কবিত্বের উৎকর্ষ প্রমাণ করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, গঙ্গাচরণের কবিতা পড়ে ইংরেজ কবিদের মধ্যে ক্রাবকে মনে পড়ে। জর্জ ক্রাবের (১৭৫৪-১৮৩২) কবিতাও বর্ণনধর্মী। গ্রাম্য জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনেই তাঁর প্রবণতা। যতটুকু দৃষ্ট, তার অতিরিক্ত চিত্রিত করায় ক্রাবের কোনপ্রকার আগ্রহ নেই। সৌন্দর্য আবিষ্কারে তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই।

উপসংহারে সমালোচক যা বিবৃত করেছেন, তা উদ্ধৃত হল:

"পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে, গঙ্গাচরণবাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর কবি বলিব না—না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।"

'অবকাশরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এর চার বৎসর পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে 'অবকাশ-

রঙ্গিনী'র সমালোচনা যখন প্রকাশিত হয় তখনও লেখক ও সমালোচকের মধ্যে বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা যখন লিখিত হয় তখন নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। ১৮৮২র কার্তিকে বঙ্গদর্শনে 'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং ওই বছরেরই শেষে চৈত্র সংখ্যা প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এক বৎসর পর ১২৮৪র বৈশাখে সঞ্জীবচন্দ্র পুনরায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের ভার গ্রহণ করলেন। সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি ভূমিকা লিখলেন। সেই ভূমিকার এক স্থানে তিনি লিখেছেন, "গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই ; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীনবাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জীবনকালে আমি নবীনবাবুর কাছে বিনীতভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" 'পলাশির যুদ্ধ' সমালোচনার পূর্বে, এমন কি কাব্যটি রচনাকালেই যে নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছিল—তার বিবরণ স্বয়ং নবীনচন্দ্রই দিয়েছেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থে নবীনচন্দ্র লিখেছেন, "একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশির যুদ্ধে'র রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে, 'পলাশির যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য—next, if at all, to Meghnad—মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগ্য।' আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, তিনি লিখিলেন উহা বঙ্গদর্শন প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয়মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন,—তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব 'সাধারণী প্রেসে' ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।"

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনা ও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনার রীতি একরূপ। প্রতি সর্গ অবলম্বনে সমালোচনা রচিত হয়েছে। পাঁচ সর্গে সম্পূর্ণ 'পলাশির যুদ্ধে'র সকল সর্গেরই পরিচয় বা প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় উত্থাপিত হয়েছে। 'পলাশির যুদ্ধে'র দোষ এবং গুণ উভয় দিকের প্রতিই সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'পলাশির যুদ্ধে'র প্রথম সর্গে ষড়যন্ত্র-সভার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং নবীনবাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে।"

"দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়।"

"তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর—বাইরণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরণ-কৃত নাবিক-দস্যুর গীত মনে পড়ে (The Corsair)।"

"তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্য-গীতের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণ-কৃত ওয়াটার্লু'র যুদ্ধের পূর্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে—There was a sound of revelry by night, &c. নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাইরণের যোগ্য—

বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধর যুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !"

চতুর্থ সর্গের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। কবির কোন প্রশংসাই নেই।

পঞ্চম সর্গ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই নেই, কেবল বলা হয়েছে, "পঞ্চম সর্গে নেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বায়রনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা।" এবং "বাইরণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।"

যে সকল অংশ উদ্ধৃত করা হল, তার মধ্যে নবীনচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানেই সমালোচনা সম্পূর্ণ হয় নি। কাব্যরচনায় নবীনচন্দ্রের দোষত্রুটির পরিমাণ কম নয়, এবং বায়রনের সঙ্গে তাঁর যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যের পরিমাণও স্বল্প নয়। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে তবেই নবীনচন্দ্রের কাব্য বা কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম সর্গের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য, "এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই, অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না।"

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের আলোচনার শেষে বলেছেন, "এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এইমাত্র, দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল, এইমাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না।"

চতুর্থ সর্গ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি, "ইংলণ্ডের রণজয় হইল—সূর্যাস্ত হইল—কবি সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যানকাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইল্ড হেরল্ডে বাইরণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণনকাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যানকাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্যের গতিরোধ করা কর্তব্য হয় নাই।"

পঞ্চম সর্গের দোষগুণের কোন কথাই নেই, কেবল একছত্রে উক্ত সর্গের মূল বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে মাত্র।

পাঁচটি সর্গের প্রসঙ্গ শেষ করে বঙ্কিমের বক্তব্য, "মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনাসকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ-কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সেক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত

সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনাসকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য-কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটনে নবীনচন্দ্র বিশেষ কবিত্ব বা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র একটি বিশেষ গুণ, তাতে উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে। 'পলাশির যুদ্ধ' উপাখ্যান বা বৃত্তান্তধর্মী রচনা, কিন্তু এতে অকারণে গীতিকাব্য প্রাধান্য পেয়েছে, মূল উপাখ্যান বা নাটকের ভাগ প্রাধান্য লাভ করে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার উপসংহারে বলেছেন, "কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।"

বঙ্কিমের এই মন্তব্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। তিনি যথার্থ কি বলতে চাইছেন? নবীনচন্দ্রকে কবি হিসাবে উচ্চ আসনে বসাতে পারি না পারি, বাংলার বায়রন বলে পরিচিত করতে পারি।—এ কথার অর্থ কি, এর মধ্যে প্রশংসার ব্যঞ্জনাই বা কতখানি রয়েছে? কোন কবিকে বাংলার ক্রাব কোন কবিকে বাংলার বায়রন বললে কি সেই সেই কবির যথার্থ পরিচয় প্রদান করা হয়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র একস্থানে লিখেছেন, "তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রণ, কেহ এমার্সন, কেহ আর কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।" পিতৃদত্ত মূল নামটি গোপন রেখে ডাক নামে পরিচয় প্রদানের রীতিকে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ—শেলি বা কীট্‌স্ নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। সেই রকম নবীনচন্দ্রকে কবি নবীনচন্দ্র হিসাবেই বিচার করতে হবে। হয় এক তিনি শক্তিশালী কবি—প্রশংসার পাত্র, নতুবা তিনি শক্তিহীন কবি—প্রশংসার যোগ্য নন। কিন্তু বাংলার বায়রন বা শেলি বললে কবির যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত

হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বাংলার বায়রন বলে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কবি হিসাবে তাঁকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচ্য কবিকে বাংলার বায়রন বলে পরিচিত করে জানিয়েছেন যে 'এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নয়।' আমাদের প্রশ্ন এ প্রশংসার স্বরূপটা কি ? তুমি বড় কবি নও, কিন্তু বায়রনের সঙ্গে তোমার কোন কোন বিষয়ে মিল রয়েছে—তাই তুমি বাংলার বায়রন—এটা কি কবির যথার্থ প্রশংসা? বায়রনের কবিতায় কিছু কিছু ত্রুটি আছে, নবীনচন্দ্রের কবিতার মধ্যেও যদি সেই ত্রুটিগুলি লক্ষিত হয়—তাহলেও কি তিনি বাংলার বায়রন! ত্রুটির দিক থেকেও তো লেখকে লেখকে সাদৃশ্য থাকতে পারে—সেই মিলের বিচারে যদি কাউকে বাংলার শেক্সপীয়র বা বাংলার 'শ বলি—তবে কি তিনি প্রশংসার যোগ্য হলেন ?

সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কোন কোন স্থানে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বায়রনে যা আছে নবীনচন্দ্রে তা নেই।

চতুর্থ সর্গের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বায়রনের 'চাইল্ড হেরল্ডে'র সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধে'র তুলনা করেছেন। সে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি। সেখানে তিনি বলেছেন—'চাইল্ড হেরল্ড' বর্ণনকাব্য, আর 'পলাশির যুদ্ধ' উপাখ্যানকাব্য ; 'চাইল্ড হেরল্ডে' যা সাজে 'পলাশির যুদ্ধে' তা সাজে না।

সমালোচক আর এক স্থানে বায়রনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের বিশেষ মিল লক্ষ্য করেছেন—কিন্তু সেটা গুণগত নয়। বায়রনেও যে গুণ নেই, নবীনচন্দ্রেও সেই গুণের অভাব—উভয়ের এই প্রকার মিল। "চরিত্রের আশ্লেষণে (synthesis) দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই।" তবে বিশ্লেষণে (analysis) উভয় কবিরই "কিছু" শক্তি আছে। ক্লাইবের নৌকারোহণ অংশ বর্ণনায় নবীনচন্দ্র বায়রনের ন্যায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, "কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটির প্রতি অনুকূল মনোভাব ছিল না তা নবীনচন্দ্রের উক্তির মধ্যেও ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র একদা 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি ছাপাবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা মুদ্রিত

করেন নি। 'পলাশির যুদ্ধ' অন্য প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। নবীনচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'স্বর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—It is unfortunate Hem should have made his *debut* before you.—তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্বে আসরে নামিয়াছেন। কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম হেমবাবুর বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন বঙ্গদর্শনে উহার—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'—সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্ষপিয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি ত কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই।"

নবীনচন্দ্র লিখেছেন, 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের পর বঙ্কিমবাবুর 'স্বর' পালটে গিয়েছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র আগাগোড়া যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করে আমাদের তো মনে হয়েছে গ্রন্থপ্রকাশের পরে ও পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি 'স্বর' বা একটি মনোভাবই প্রথমাবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মুদ্রিত করতে চাইলে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে।" এখানে প্রশ্ন, কার অগৌরব? 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের, না বঙ্গদর্শন পত্রিকার?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" এতদিন পর্যন্ত আমরা সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি নি। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর যে-সকল সমালোচনা সংকলিত হয়েছে তাতে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, কিন্তু তাঁর কালের সাহিত্যগ্রন্থাদির দোষগুণের বিচারের কোন নিদর্শন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিমের সমালোচনা-কার্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমকালীন গ্রন্থের সমালোচনার কথাই বলেছেন, সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারমূলক রচনার কথা নয়। একালের পাঠক সাময়িকসাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নন। বর্তমান অধ্যায়ে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুদ্ঘাটিত দিকটির প্রতি কিছু অলোকপাত করতে সচেষ্ট হয়েছি।

বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-পত্রিকা—বঙ্গদর্শন। বর্তমান অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনা বা পুস্তক-সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছিল তা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করব।

বঙ্গদর্শনে সাহিত্য-গ্রন্থের সমালোচনা দুটি স্বতন্ত্র রীতিতে সম্পাদিত হত। কোন কোন গ্রন্থের সমালোচনা কখন কখন সবিস্তারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হত, যেমন 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনা; বাদ বাকি সকল গ্রন্থ 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগে সংক্ষেপে বা বিস্তারিত ভাবে সমালোচিত হত। 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকার একমাত্র নিয়মিত বিভাগ। পূর্ববর্তী পত্রপত্রিকার রীতি অনুসারে বঙ্গদর্শনেও সকল লেখক বা সমালোচকের নাম প্রকাশিত হত না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও খুব অল্প লেখাতেই নাম প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন, "মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।"[১] বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে এই প্রবন্ধটি পড়েন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে রচনাটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বর্জিত উক্ত পত্রিকার পাঠের একস্থানে আছে, "সাহিত্যের পক্ষে যাহা-কিছু অযোগ্য, যাহা-কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জনা করিতেন না। এই সমস্ত স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষণজীবীদের

১. এ-বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছি 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'সেকালের ছড়া ছবি ও প্রহসনে বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ও ২৭ আষাঢ় ১৩৭৭।

প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষত তখনো বাংলা লেখার শৈশব-অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই, লেখকেরা তখনো বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়মসকল ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে-অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণত উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দয়ভাবে ঠক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার জো করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।" সাহিত্য-বিচারালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উন্নত আদর্শ ও কঠিন বিচারকসত্তার পরিচয় পেতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী নয়, তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইলের মধ্যে আমাদের নতুন করে প্রবেশ করতে হবে।

আমরা এখানে বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা বিভাগের মূল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কি না; কিংবা, এই বিভাগে তাঁর রচনার পরিমাণ কতখানি—ইত্যাদি বিচার ও বিতর্কে প্রধানতঃ না গিয়ে এই পুস্তক-সমালোচনা বিভাগটিকে এককথায় বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা রূপে গ্রহণ করে সেই সমালোচনার স্বরূপ ও বিশিষ্টতা কতখানি তা নিরূপণ করতে চেষ্টা করব। এবং এ-প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম-সম্পাদিত পর্বটিই আমরা নির্বাচন করে নিলাম।

বঙ্গদর্শনে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বা 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগটির কাজ শুরু হয় পত্রিকার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা থেকে। কার্তিকে এই বিভাগটির নাম ছিল 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা', তবে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন'। এই নামটি শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল।

সমকালে প্রকাশিত সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত সঙ্গীত স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কেই সমালোচনা এই বিভাগে প্রকাশিত হয়। আমরা এখানে মুখ্যতঃ সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি বঙ্গদর্শনে কিভাবে সমালোচিত হয়েছে তা লক্ষ্য করব।

১২৭৯র অগ্রহায়ণে অর্থাৎ প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় বঙ্গদর্শনের সমালোচন বিভাগে একটি মাত্র গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি কবিতাপুস্তক, নাম 'কাব্যমালা'। গ্রন্থমধ্যে কবির নাম নেই। সমালোচক জানিয়েছেন এই গ্রন্থের অন্তর্গত সকল কবিতাই আদিরসাত্মক। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বিচার করতে চেয়েছেন সাহিত্যে আদিরসের স্থান কোথায় এবং কতখানি। সমালোচক লিখেছেন, "কবিতাগুলির সকলই আদিরসঘটিত। তাহা হইলেই দোষের হইল না। যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতি প্রেম—যাহা সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের ধর্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরসঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ কথা কহিলেই, লোকে ইংরাজিওয়ালা এবং সুসভ্য বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ড মূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিত্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চক্ষে সকলই সমল। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কুক্রিয়ার অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণীর মধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্মের সহায় হয়, তবে তাহাকে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থখানি সেই মহাদোষে দূষিত।" এই সমালোচনা পাঠকালে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য[১] সহজেই মনে পড়ে। ভাষা এবং বক্তব্য—এই উভয় দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সমালোচনার সঙ্গে 'কাব্যমালা' গ্রন্থের সমালোচনার আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

যে কবি 'কাব্যমালা' গ্রন্থের রচয়িতা, পৌষ সংখ্যায় তাঁরই রচিত আর একটি

১. বর্তমান গ্রন্থের ৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম 'ললিত কবিতাবলী'। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নেই, পরিবর্তে লেখা আছে, 'কাব্যমালার রচয়িতৃ প্রণীত'। সমালোচক স্পষ্টই জানিয়েছেন, "এ গ্রন্থখানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িতৃ প্রণীত বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না। এ কবিতাগুলি ভাল।" সমালোচকের মতে কবি বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'কাব্যমালা'র ন্যায় এই কাব্যের কবিতাগুলি আদিরসদোষে দুষ্ট নয়।

বলদেব পালিত প্রণীত 'ভর্তৃহরি কাব্য' ভর্তৃহরি বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত তিন সর্গে সম্পূর্ণ কাব্য। 'ললিত কবিতাবলী'র কবি বাংলা কবিতায় বিবিধ সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কৃতকার্য হয়েছিলেন; 'ভর্তৃহরি কাব্যে'র কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে অধিকতর দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সমালোচকের মন্তব্য, "এই কাব্যগ্রন্থখানি, আদ্যোপান্ত অপূর্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব কবিগণ, দুই একটি সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃতচ্ছন্দ বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি 'ললিত কবিতাবলী' প্রণেতা এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেববাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতচ্ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মালিনী, উপজাতি প্রভৃতিতে বাঙ্গালা কবিতা যেমন স্থানে স্থানে মধুর ও ওজোগুন বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনেক স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে। 'ভর্তৃহরি কাব্য' সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকে সচরাচর বুঝিতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহ। যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু কষ্ট করিয়া যে কবিতার অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ পাঠক পড়িতে অনিচ্ছুক।" উদ্ধৃত অংশের শেষ ছত্রে সমালোচক যা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যেও সে রকম বক্তব্য একটু লক্ষ্য করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই রকম কথা তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য?

যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন মাত্র পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না।" এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন।

বঙ্গদর্শনে তীক্ষ্ণ কঠোর এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় অন্নদাসুন্দরী প্রণীত 'অবলা বিলাপ' কাব্যের সমালোচনায়। উনিশ শতকে এমন একটা সময় গেছে যখন বাংলা ভাষায় কোন মহিলা সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হলে বুদ্ধি বিচার ত্যাগ করে সমকালীন মানুষ সেই ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব এক মহামূল্যবান ব্যাপার বলে গ্রহণ করে নিত। সাহিত্য-সমালোচকও সাহিত্য-বিচার করতে গিয়ে মূল গ্রন্থের দিকে না তাকিয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতেন! ফলে গ্রন্থকর্ত্রী যাই লিখুন, তিনি সুখ্যাতির পাত্রী হতেন। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে অনাবশ্যক সহানুভূতির কোন প্রবেশাধিকার নেই, সমাজ-জীবনে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যতই বিস্তর ব্যবধান থাকুক, সাহিত্যের বিচারালয়ে উভয়ের বিচারের মানদণ্ড একটিই; এবং সে দণ্ড একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ। বঙ্গদর্শনের সমালোচক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, "স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব; স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না।" তাই 'অবলা বিলাপ' কাব্যের অন্নদাসুন্দরী দাসী বঙ্গদর্শনের কাছে কোন রকম সহানুভূতির সুযোগ পান নি।

মাঘ সংখ্যায় কালীময় ঘটক প্রণীত 'পদ্যময়' প্রথম ভাগ, উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত 'পদ্যমালা', তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিতাকুসুম' প্রথম ভাগ, শ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত 'সদ্ভাবকুসুম' প্রভৃতি কবিতাপুস্তকের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে দু-চার ছত্রে করা হয়। কোন গ্রন্থই বঙ্গদর্শনের আনুকূল্য লাভ করে নি।

ফাল্গুন সংখ্যায় যে কটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে গজপতি রায় সংকলিত 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "অগ্রে ধনাঢ্য লোকের এক এক জন করিয়া কথক (গল্পবক্তা) থাকিত, প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম ভেদে পল্লীস্থ ও গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব স্ব দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া ঐ ধনাঢ্য লোকের বৈঠকখানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গরস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া উপজীবিকার শ্রম দূর করিত। এক্ষণে সে চাল আর নাই, এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান 'আপনি আর কপণি' কিন্তু উপজীবিকার্থে সেই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া শ্রম দূরার্থ ইচ্ছা সেই প্রকারে বলবতী, কিন্তু উপায় অভাব, সেই অভাব পূরণার্থ 'নবন্যাসাদির উৎপত্তি'।" এই গ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্গদর্শনের বক্তব্য, "যদি এমত শ্রেণীর কোন পাঠক থাকেন যে, এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাঠ করুন। কিন্তু আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এরূপ নীচাশয় লেখকদিগের সংখ্যা দিন দিন অল্প হউক। এরূপ লেখকদিগের দ্বারা সাধারণের কোন মঙ্গল সিদ্ধ হয় না বরং অমঙ্গল জন্মে।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন, "আমরা লেখকের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার একটি গুণ আছে—ভাষা অতি সরল। যাঁহারা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ও পদ ত্যাগ করিয়া সচরাচর পরিশুদ্ধ কথোপকথনের ভাষা অবলম্বন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা ভালই করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইতর লোকের ভাষা অবলম্বনীয় নহে।" 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে বিশেষভাবে সমর্থন করলেও হুতোমি কথ্য ভাষাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে সেই সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, "তাই

বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।" 'ঐতিহাসিক নবন্যাসে'র ভাষার সরলতা গুণ আছে, কিন্তু সে ভাষা অশালীন ও পবিত্রতাশূন্য বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

'সৌদামিনী উপাখ্যান', 'গন্ধেশ্বরী বিলাপ কাব্য', 'নলদময়ন্তী কাব্য', 'প্রমীলাবিলাস'—এই কবিতাপুস্তকগুলি ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে সংক্ষেপে সমালোচিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় এই কবিতাগুলিও সমালোচকের কোন সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয় নি।

চৈত্র সংখ্যায় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'—এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এই সমালোচনা দুটিকে তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিমরচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হিসাবে সংকলন করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই রচনা দুটির পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে কাব্যের সমালোচনা ব্যতীত প্রহসন ও নাট্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রাধান্য পায়। এ ছাড়া সমকালে প্রকাশিত অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সমালোচনাও এই দুই বৎসরে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

'মানসরঞ্জন কাব্য', 'ঋতুবিহার', 'বিরহবিলাস', 'বঙ্গশ্রুতবোধ'—এই কবিতাপুস্তকগুলি ১২৮০র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় সমালোচিত হয়। সমালোচিত হয় অর্থে সমালোচনার বাণে কঠিনভাবে আহত

করা হয়। বঙ্গদর্শনের চোখে এই কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্গত কোনটিই প্রশংসার যোগ্য নয়। কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সচরাচর বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অপ্রশংসনীয়, ইহাও সেইরূপ', আবার কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'গ্রন্থখানি অপাঠ্য'। 'কবিতাহার' জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত একখানি কাব্যগ্রন্থ। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় অন্নদাসুন্দরী দাসী নামে এক মহিলা-কবির কাব্যের কঠিনতম সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কাব্য-সমালোচকের মন্তব্য ছিল—'স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব, স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না'। 'কবিতাহার' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন, "শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত।" এস্থানে প্রমাণিত হচ্ছে সাহিত্য-সমালোচনায় বঙ্গদর্শন নারী পুরুষ, প্রাচীন নবীন, পরিচিত অপরিচিত বা খ্যাত অখ্যাত বিচার করে নি, কেবল গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণ বিচার করাই ছিল উক্ত পত্রিকার উদ্দেশ্য।

'উৎকল দর্শন', 'বিশ্বদর্শন', 'বঙ্গমিহির', 'তমোলুক পত্রিকা', 'মাসিক প্রকাশি', 'পূর্ণশশী', 'অবকাশ তোষিণী', 'হরবোলা ভাঁড়'—এগুলি এক একখানি সাময়িক পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে কোন সংবাদপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। ১২৮০র আষাঢ়ে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগের শেষে মুদ্রিত হয়েছে—"আমরা কয়েকখানি অভিনব সংবাদপত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহার সমালোচনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সংবাদপত্রের সমালোচনা আমাদের রীতি নহে, এবং আমরা সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহি। যাঁহারা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা মার্জনা করিবেন।"

বঙ্গদর্শনে ১২৮০র বিভিন্ন সংখ্যায় সমকালীন অনেকগুলি নাটকের সমালোচনা মুদ্রিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত 'নন্দবংশোচ্ছেদ' শীর্ষক একখানি 'করুণরসাশ্রিত নাটক' সমালোচিত হয়। বঙ্গদর্শনের সমালোচক প্রথমেই লিখেছেন, "আমরা বলিতে পারি না যে নন্দবংশোচ্ছেদ নাটক পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা

ইহাও বলিতে পারি না যে ইহা পাঠ করিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" এখানে দেখা যাক সমালোচক কেন নাটকটি পাঠ করে প্রীতিলাভ করেন নি। এর কারণ, নাটকটি শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অনুকরণে রচিত, কিন্তু সেই অনুকরণে নাটকের কোন উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় নি। সমালোচক লিখেছেন, "কাব্যের অনুকৃত কাব্য প্রায় অত্যুৎকৃষ্ট হয় না।··· বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায় অধিকাংশ অনুকরণ মাত্র—এখন অনুকরণ যত অল্প হয় ততই ভাল। অনুকরণপ্রবৃত্তিজাত উৎকৃষ্ট কাব্যের অপেক্ষা লেখকের নিজ কল্পনাপ্রসূত একখানি নিকৃষ্টতর কাব্যের অধিক আদর করিতে প্রস্তুত আছি।" বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন—"কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।" কিছু কিছু দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকটি বঙ্গদর্শনের আনুকূল্য লাভ করে। বঙ্গদর্শনের মতে, "আধুনিক নাটকের অবস্থা ভাবিতে গেলে নাটকখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকাংশ বাংলা নাটক ইহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট।" বঙ্গদর্শন এই নাটকটিকে অভিনয়ের যোগ্য বলে মনে করে।

রাধানাথ বর্ধন প্রণীত 'সরোজিনী নাটক', মীর মশারফ্ হোসেন প্রণীত 'জমীদারদর্পণ নাটক' এবং 'গ্রেট বারবারস্ ড্রামা—নাপিতেশ্বর নাটক' (নাট্যকারের নাম নেই)-এর সমালোচনা দ্বিতীয় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক নাটকের দুরবস্থার কথা 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটকটি আলোচনার সময় বঙ্গদর্শনে উল্লিখিত হয়। 'সরোজিনী নাটক' সমালোচনার সময় বঙ্গদর্শনের মন্তব্য একই—"যেরূপ অপাঠ্য, অনভিনেয় নাটক নিত্য প্রকাশ হইতেছে, ইহা তাহারই সহস্রতম সংস্করণ মাত্র।" ভাষা এবং রুচি— উভয়দিক থেকেই নাটকটির অপ্রশংসা করা হয়। 'জমীদারদর্পণ নাটক' মুসলমান লেখক মীর মশারফ্ হোসেন কর্তৃক রচিত। মুসলমানের রচিত হলেও লেখকের ভাষাটি বিশুদ্ধ, মুসলমানি বাংলার চিহ্নমাত্র তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত। নাটকের নামটি 'নীলদর্পণ' প্রভাবিত। 'নীলদর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করা, বর্তমান নাটকের উদ্দেশ্য সাধারণ প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্যমূলক হলেও 'নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে' বলে বঙ্গদর্শন মন্তব্য করেছে।

কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্য কি? সৌন্দর্যসৃষ্টি না সমাজসংস্কার? এই প্রশ্ন সমালোচক তুলেছেন 'গ্রেট বারবারস্ ড্রামা বা নাপিতেশ্বর নাটক' আলোচনা প্রসঙ্গে। সমালোচকের বক্তব্য, "নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি—সমাজসংস্করণ নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া, সমাজসংস্করণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে, নাটকের নাটকত্ব থাকে না। কাজে কাজেই সে সকল নাটকের তাদৃশ উৎকর্ষ জন্মিতে পারে না এবং জন্মেও না। তবে এ সকল লেখকদিগের উদ্দেশ্য উত্তম; তাঁহাদিগের নাটক প্রণয়নের ফলও হিতকর; অতএব সে সকল নাটকে আমাদিগের আপত্তি নাই। বরং তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করি। নীলদর্পণ প্রভৃতি সময়োপযোগী এবং সুফলোৎপাদক এবং কবিত্বগুণবিশিষ্টও বটে বলিয়া আমরা সে সকলের আদর করি। কিন্তু যখন নাটককারেরা আরও একটু নামিয়া, ফৌজদারী আদালতের মোকদ্দমার ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি নাটক জুড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন নাটক নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিতে। সেখানে তিনি বলেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।"

দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ সংখ্যায় হরলাল রায় প্রণীত 'হেমলতা নাটক' এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত 'অমরনাথ নাটকে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'অমরনাথ নাটক'এ প্রশংসার বিষয় কিছুই নেই, তাই সমালোচনাটি সংক্ষিপ্ত। তবে হরলালের 'হেমলতা নাটক'টির সমালোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়। কতকগুলি স্পষ্ট প্রমাণে সমালোচনাটি আমাদের মতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। সে প্রমাণের কথা পরে উল্লেখ করছি; তার পূর্বে নাট্য-সমালোচনাটির বক্তব্য বিষয় কি তা লক্ষ্য করা যাক। এখানে সমালোচক নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের মতে, "অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, ও কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নবেল রচয়িতার প্রধান কার্য।" এই প্রভেদ নির্ণয়ের প্রধান কারণ আলোচ্য নাট্যগ্রন্থটি যে পরিমাণে রসপূর্ণ উপন্যাস হয়ে উঠেছে সে পরিমাণে ঘাত প্রতিঘাতমূলক যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে আলোচক সংস্কৃত নাটক 'উত্তরচরিতে'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন 'উত্তরচরিতে'র তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ 'নবেল' এবং কতটুকু নাটক। সমালোচক লিখেছেন, "ছায়ারূপিনী সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন; পূর্বসুখানুস্মৃতিক্রমে অন্তর্বিচলিতা হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ মানস-চালন নাটক নহে; ইহা নবেল। যখন মত্ত হস্তী আসিয়া সীতার পঞ্চবটী বাস সময় পালিত করিশাবকের প্রতি আক্রমণ করিল, বাসন্তী দেখিতে পাইয়া, 'সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সীতা মোহবশতঃ যখন 'আর্য পুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা কর' বলিয়া রামকে সম্বোধন করিলেন, তখন উত্তরচরিত নবেল, নাটক নহে। বাসন্তীমুখনির্গত শব্দশ্রবণে সীতা মানসচালিতা হইয়াছিলেন, বাসন্তীর বাক্য ঘাতে নহে। ঘাত প্রতিঘাত না হইলে নাটক হয় না। আবার যখন রাম বিমান রাখিতে বলিলে সীতা তাঁহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'একি! কে এ জলভরা মেঘের মত স্তনিত গম্ভীর শব্দ করিল? আমার শ্রবণ বিবর ভরিয়া গেল! আজি এ মন্দভাগিনীকে কে সহসা আহ্লাদিত করিল?' তখনও সীতা

নবেলের নায়িকা। এদিকে পঞ্চবটী দর্শনে রামের শোকপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; রাম 'সীতে, সীতে' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন; এ শোক নবেলের শোক, এ উচ্ছ্বাস নবেলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?' তখনই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইল। দুই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রশ্ন শুনিয়া রাম ভাবিতে লাগিলেন 'বাসন্তী মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? আর প্রথমেই কুমার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? এইরূপ অন্তঃচালন নাটকের জীবন। বাসন্তী আঘাত করিতেছেন, 'আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?' আঘাতের ফল: 'লোকে বুঝে না বলিয়া'। পুনরায় আঘাত: 'কেহ বুঝে না?' আঘাতে অবসন্ন অন্তঃপ্রকৃতি উত্তর দিল 'তাহারাই জানে।' পুনর্বার কঠোর আঘাত: 'নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!' রাম প্রকৃতি-ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার কিছু পরেই আবার বাসন্তী হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। রাম শোকপ্রবাহের উল্টাবাণ বাসন্তী হৃদয়ে আঘাত করিল; বাসন্তী রামকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে বলিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, রামকে অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন।"

এখন সতর্কভাবে দেখা যাক 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য কি, তাঁর প্রকাশরীতিটি কিরূপ এবং তৎসহ দেখা প্রয়োজন ভাব ও ভাষার দিক থেকে 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচনা ও 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান কি না? 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়া পরম্পরা নায়ক-নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।" 'হেমলতা নাটকে'র

সমালোচনায় নাটক ও নভেলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে, 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে নভেলের পরিবর্তে কাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মূলতঃ উভয় সমালোচনাতেই বলা হয়েছে, 'উত্তরচরিত' নাটকের সর্বত্র যথার্থ নাট্যগুণ বিদ্যমান নেই, বরংচ তার কাব্যগুণ বা উপন্যাসের লক্ষণ সে তুলনায় অনেক বেশি। এখন উভয় সমালোচনার মধ্যে বর্ণনা ও ভাষাগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে কি না লক্ষ্য করা যাক। 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনায় 'উত্তরচরিতে'র প্রসঙ্গ যে-অংশে আছে তা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, এবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তর-চরিত' শীর্ষক সমালোচনার মধ্য থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ছত্রগুলি উদ্ধার করা গেল। (ক) সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। (খ) তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 'সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!' (গ) রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, 'আর্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!' (ঘ) এ দিকে রামচন্দ্র লোপমুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্চ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?' (ঙ) এদিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, 'সীতে! সীতে!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (চ) বাসন্তী রামকে পূর্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া,—সখীনির্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল

আছেন ত?' কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না—তিনি সীতাকরকমল-বিকীর্ণ জলে পরিবর্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতা-করকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?' এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী 'মহারাজ!' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন। (ছ) বাসন্তী কহিলেন, 'আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?' (জ) রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া। (ঝ) বাসন্তী। কেন বুঝে না? (ঞ) রাম। তাহারাই জানে। (ট) তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।'

'উত্তরচরিতে'র তৃতীয় অঙ্কের কোথাও কোথাও নাট্যলক্ষণ প্রকাশ পেলেও এই অঙ্কের সর্বত্র যে যথার্থ নাট্যগুণ প্রকাশ পায় নি সে কথা 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনায় বলা হয়েছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।" বক্তব্য ও ভাষারীতির এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে মনে হয় 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনাটি 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

১২৮০ চৈত্র সংখ্যায় নিমাইচাঁদ শীল প্রণীত 'তীর্থমহিমা' নামক একটি

নাটকের উল্লেখ করা হয়। গ্রন্থটি প্রশংসার যোগ্য না হওয়ায় বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থের কোন বিস্তারিত পরিচয় লিখিত হয় নি।

১২৮১র বঙ্গদর্শনে আরও কতকগুলি নতুন নাটকের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়। সেগুলি হল 'পল্লীগ্রামদর্পণ', 'স্বর্ণলতা নাটক', 'রামোদ্বাহ নাটক', 'পুরুবিক্রম নাটক', 'কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী', 'তারাবাই' এবং 'গৌড়েশ্বর নাটক'। এই প্রত্যেকটি গ্রন্থের সমালোচনাই সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়।

'প্রমোদিনী', 'হেমলতা', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব'—এগুলি সমকালীন সাময়িক পত্র; ১২৮১র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় সমালোচিত হয়। পাকুড় প্রমোদিনী সভা থেকে প্রকাশিত 'প্রমোদিনী' নামক সাময়িকপত্রের প্রথম খণ্ডের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয় বৈশাখ সংখ্যায়। সমালোচক একস্থানে বলেছেন, "গদ্য প্রবন্ধ তিনটি। দুইটি উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হুতোমী নক্সা। এখন এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহা বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই—কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প বা নক্সায় বিশেষ লাভ নাই। গদ্যের মধ্যে 'কল্পনা মুকুর' নামক প্রবন্ধের ভাষাটি কথঞ্চিৎ ভাল। 'পাগলের প্রলাপ' হুতোমী—সুতরাং তাহার ভাষায় ভাল কিছু নাই। 'বিচিত্র অঙ্গীকার' নামক প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃতবহুল এবং অপ্রশংসনীয়। ইহা আদ্যোপান্ত অনর্থক শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। লেখক কি কাদম্বরীর অনুকরণে চেষ্টা পাইয়াছেন? সে প্রবৃত্তি ভাল নহে। আমরা ইতর লোকের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে বলি না। যে ভাষা সরল, অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয়। লেখকদিগের অলঙ্কার-প্রিয়তা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র রুচিহীন হুতোমি নক্সা বা তার ভাষা পছন্দ করতেন না—সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন দেখা যাক সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কি নির্দেশ। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এই সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার

চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।…সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'হেমলতা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সমালোচক লিখেছেন, "সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লিখিবেন। আমাদের অনুরোধ যেগুলি স্ত্রীলোকের, সেগুলি স্ত্রীলোকের বলিয়া চিহ্নিত করা থাক। এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আর একটি, যাহাতে স্ত্রীলোক লিখিবে তাহা অধিকতররূপে স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। তবে হেমলতা মধ্যে, এত ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন?" বাংলা প্রবন্ধে অনাবশ্যক কারণে বিদেশী কোটেশনের বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও বিরক্তিকর ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না।…বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জর্মান কোটেশন্‌ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।" একথা বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বলেন।

'আর্যদর্শন' ও 'বান্ধব' এই দুটি মাসিক পত্রিকা ১২৮১র শ্রাবণ সংখ্যায় সমালোচিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকাটি ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পূর্ববঙ্গেও উৎকৃষ্ট সাময়িকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে দেখে সমালোচক আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, "পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর, লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে, বাঙ্গালায় একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।" যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' পত্রিকাটি সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যে প্রভেদ কোথায় এবং উভয়ের মূল বৈশিষ্ট্য কি তা আলোচনা করেছেন। সমালোচকের বক্তব্য, "কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই

জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনু-অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন, স্ববুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য য়ুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন ; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদবধ, ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী, 'Merry Wives of Windsor' নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই একজন বিশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে ; ভাল হইলেও, উপকারিতা সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে আর্যদর্শন লেখকেরা এ বিষয়ে যথার্থ কার্যকারিতা বুঝিয়াছেন। ইহা সদ্বিবেচনা এবং বিজ্ঞতার কাজ হইয়াছে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা।" এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোস-গল্প' হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক ; 'জলধর' 'জগদম্বা' 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত। বাঙ্গালি-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না, জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই, যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিদ্ ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে

কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয় ?" 'আর্যদর্শনে'র সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে ? মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। 'আর্যদর্শনে'র সমালোচকের বক্তব্য, যে জাতি নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে সে জাতির পক্ষে সাহিত্যে অনুবাদ কার্যটি সুসাধ্য এবং সাধারণের উপকারী, কিন্তু যে জাতি পূর্ব থেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যে সাহিত্য দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ সে জাতির সাহিত্যে অনুকরণ কার্যটি সহজসাধ্য ও মঙ্গলকর। শিক্ষিত শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই শুধু সাহিত্যিক অনুকরণ কার্যটি করা সম্ভব, সাধারণ লেখকের পক্ষে অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সহজতর।

১২৮১র বঙ্গদর্শনে কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনার মধ্যেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুকরণের কথা ওঠে। উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হল। মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত 'কাব্যপেটিকা' সংস্কৃত পদ্যে রচিত খণ্ডকাব্য। সংস্কৃতে রচিত হলেও বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থটির বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক লিখেছেন, "এ গ্রন্থকারের অনুকরণ স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মহদ্দোষ এই, ইহার অধিকাংশ কবিতা নিম্নশ্রেণীস্থ সংস্কৃত কবির অনুকৃতিমূলক। সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। আমরা যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার না করিয়া বিবেচনা না করিয়া তখনই তদভিমুখে ধাবমান হই। কিন্তু একথা অন্যান্য পক্ষে যাহা হউক এ পক্ষে তত শোভমান নহে। আমাদিগের অনুকরণপ্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে অনুকরণ করিলে চলিবে না। রচনা বিষয়ে অনুকরণের আরও মহদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বসেন। এ বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে; পাঠক দেখিবেন অনেক আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সাময়িকপত্রিকা লেখকদিগের এই দশা।" মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেছিলেন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে রামকুমার নন্দী 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' রচনা করেন। সমালোচক লিখেছেন, "কাব্য সম্বন্ধে, কেবল ইহাই বলা প্রয়োজন যে, কাব্যখানি আদ্যোপান্ত বীরাঙ্গনার অনুকরণ—অনুকরণের

অনুকরণ—সুতরাং ইহাতে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু দেখা যায় না।" আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রমোদকামিনী কাব্যে'র সমালোচনাতেও একই বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "গোল্ডস্মিথ প্রণীত 'হর্মিট' নামক গীতিকাব্য অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গোল্ডস্মিথের ঐ কাব্যও প্রাচীনতর গীতিকাব্যের অনুসারী। অতএব ঐখানি নকলের নকল। বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ এইরূপ হইতেছে। 'নকল' শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ ইহা সর্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।" এ সব লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়, তবে একমাত্র প্রতিভাশালী কবির পক্ষেই যে অনুকরণের মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা সম্ভব সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গদর্শনের মূল্যবান বিস্মৃত সাহিত্য-সমালোচনাগুলির প্রতি একালের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে সমালোচনার সমালোচনা করবার প্রয়োজন অনুভব করি নি। বঙ্গদর্শনের সমালোচনাগুলি পাঠ করে বঙ্গদর্শন-সমকালীন বাংলাদেশের সাধারণ সাহিত্য-চর্চার পরিবেশটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বঙ্গদর্শনে সমকালীন যে-সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় আজ তার অধিকাংশই বিলুপ্ত। সাহিত্যের ইতিহাসেও এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম আমরা সংগ্রহ করে রাখি নি। বঙ্গদর্শনে সমালোচিত মূল গ্রন্থগুলি সংগ্রহের কোন প্রকার উপায় না থাকায় গ্রন্থ-সমালোচনার সমালোচনা করবার আপাততঃ কোন সুযোগ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকরূপে। উপন্যাস ও প্রবন্ধরচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে পরিণত বয়স পর্যন্ত কবিতারও অনুশীলন করেছিলেন সেকথা অনেক সময় পাঠকের স্মরণ থাকে না। বর্তমান অধ্যায়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের সেই বিস্মৃত অনালোচিত দিকটির পরিচয়দানের চেষ্টা করা হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত প্রথম প্রকাশিত পুস্তক একখানি কাব্যগ্রন্থ। নাম 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৭৮এ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রণীত 'কবিতাপুস্তক' নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে 'ললিতা' ও 'মানস' পুনর্মুদ্রিত এবং বঙ্গদর্শন ও 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি অতিরিক্ত কবিতা সংযোজিত হয়। ১৮৯১এ এই গ্রন্থটির ভিন্ন নামে পুনঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রন্থের নতুন নাম হয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতা-পুস্তক'। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। 'পুষ্পনাটক' প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। 'দুর্গোৎসব' 'বঙ্গদর্শন' হইতে এবং 'রাজার উপর রাজা' 'প্রচার' হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতাপুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১এ, মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পূর্বে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষবয়সের রচিত কবিতাগুলিও সংগ্রহ করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক বা প্রাবন্ধিক হলেও কাব্যরচনার প্রতিও তাঁর কোনরকম ঔদাসীন্য বা অনুৎসাহ ছিল না। আমাদের অনেকেরই ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাল্যকালেই কাব্যচর্চা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি আর কবিতা রচনা করেন নি। এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, দেখা যাচ্ছে, বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে কবিতাও রচনা করেছেন। শুধু বঙ্গদর্শন নয়, সমকালীন 'ভ্রমর' এবং 'প্রচার' পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৮৫২র ২৫ ফেব্রুঅরি থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে একস্থানে বলেছেন, "আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' কর্তৃক একটি কবিতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করে এই প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক লাভ করেন। কবিতাটি ১৮৫৩র ১৮ মার্চ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কবিতা লেখেন তখন তিনি হুগলী কলেজের ছাত্র। এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ-লিখিত একখানি পত্র উদ্ধার-যোগ্য—

To the Secy. to the Council of Education, Fort William.

Hooghly, the 20th Feb, 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J. Kerr

Principal

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম কাব্যচর্চা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স তের বৎসর আট মাস। এই সময়ে রচিত তাঁর অধিকাংশ কবিতা ছিল আদিরসাত্মক। নারী

ও পুরুষের কথোপকথনের ভিত্তিতে কবিতাগুলি লেখা। যেমন কোন কবিতা 'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন', আবার কোন কবিতা 'বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ'। বাল্যবয়সে এই শ্রেণীর কবিতা রচনার পিছনে কিছু ব্যক্তিজীবনের প্রভাব থাকতে পারে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুঅরি মাসে তাঁর দশ বৎসর আট মাস বয়সে। অপর দিকে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশের সূত্রপাত তের বৎসর আট মাস বয়স থেকে। সুতরাং বিবাহের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে তের বৎসর বয়সের কোন কিশোরের রচিত কবিতায় যদি রসের সূক্ষ্মতার কিছু অভাব দেখা যায় তবে তাকে খুব স্বাভাবিক বলেই স্বীকার করতে হয়। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বাল্যকালের কবিতাগুলি রসের ভিত্তিতে নয়, একমাত্র উপকরণের ভিত্তিতেই বিচার করা সঙ্গত হবে। আর, এই দিক থেকে বিচার করলে, কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কোন সাহিত্যিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা তা হয়ত উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

পূর্বেই বলেছি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের কবিতাগুলি অধিকাংশই পতি ও পত্নীর কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত। স্পষ্টতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের এই রীতি সংস্কৃত ঋতু-কাব্যের অনুগত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন প্রচলিত রীতির অনুকারী। ভাষা ও রুচিতে মৌলিকতা কিছু নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব লক্ষণীয়। কবিতা-রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসাহদান করেছিলেন তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।···দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।" কবিতা-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে-ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, সেই-ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিরূপ মতামত ব্যক্ত করেন দেখা আবশ্যক। ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র

পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা সমালোচনা করে বলেন, "বঙ্কিম পদ্য রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা কাব্যের জন্যই হইবে। কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদবিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেন। এবং 'এবে', 'করয়ে', 'ছেনু', 'গেনু' ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্যরসের উপাসনা করা কর্তব্য হইতেছে, তাঁহার পদ্য অস্মদাদির অন্তঃকরণকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে এবং অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন রসের এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য হল—ক. ললিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে, খ. 'এবে' 'করয়ে' ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দ পরিহার করতে হবে, এবং গ. আদিরসের পরিবর্তে কিছু ভিন্ন রসের কবিতা লিখতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে অর্থাৎ বঙ্গদর্শন 'প্রচার' ইত্যাদি পত্রিকায় যে সকল কবিতা লেখেন, সেগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ ও নির্দেশ অনেকাংশে পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রচিত কবিতাগুলির সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, সেটি হল নারীদেহের বিস্তৃত রূপবর্ণনা এবং সেই রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে উপমা প্রয়োগের বিপুল সমারোহ।

দেহসৌন্দর্যবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা বিমলা আশমানি ও আয়েষা, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা মতিবিবি ও শ্যামাসুন্দরী, মৃণালিনীতে মনোরমা ও গিরিজায়া, বিষবৃক্ষে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী এবং চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী ও দলনীর বিস্তৃত রূপবর্ণনা পাই। এই রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পরিণত কবিদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাল্যকালের রচিত কবিতাগুলির মধ্যে সেই পরিণত কবি-প্রকৃতিরই একটি প্রাথমিক পরিচয় লাভ করা যায়।

এখন দেখা প্রয়োজন, ১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিতায় এবং তৎপরবর্তী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নারীরূপের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—তার প্রকৃতিগত মিল এবং অমিল কতখানি। এই দিক থেকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে,

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের কবিপ্রকৃতি পরবর্তীকালে তাঁর ঔপন্যাসিক কবি-প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করতে কতখানি সহায়তা করেছে কিংবা আদৌ সহায়তা করেছে কিনা।

উপন্যাসে নারীর রূপবর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট প্রবণতা হল রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিচিত্র কল্পিত রূপকথা-ধর্মী কাহিনীর সংযোজন। সাপের মাথায় ফণা কেন, স্ত্রীলোকের ঘোমটা সৃষ্টির আদিকথা কি, দাড়িম্ব ফল বঙ্গদেশ ত্যাগ করে পাটনা অঞ্চলে পলায়ন করল কেন—ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃত উদ্ভট কাব্যের রীতি অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনী নির্মাণ করেছেন রমণীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে।[১] এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রচিত কবিতার মধ্যে এই শ্রেণীর বর্ণনা পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ' কবিতায় পতির উক্তি,

আরো দেখ করিবরে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে
চিৎকার করিছে কুঞ্জর॥
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্বের সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকি ঢাকি, কেশেতে সিন্দূর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ॥

'কামিনীর প্রতি উক্তি—তোমাতে লো ষড় ঋতু' কবিতায়,

বরষায় মনোহর, তরু শোভাকর।
দাড়িম্ব দেখি লো ধনি, তব পয়োধর॥
গিরি পরি নব লতা, শোভে এ সময়।
সে গিরি তোমার কুচ, হার লতা হয়॥
এ সবেতে, পরাভব, বরষা পলায়।
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায়॥

১. দুর্গেশনন্দিনীতে আশমানির রূপবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন' কবিতায় নারীর প্রশ্ন,

কেন ফণিবর, প্রবেশি বিবর,
পাতালে গমন করে।

পতির উক্তি,

বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি,
পলাইল বিষধরে ॥
যদি বল ধনি, দূর হলে ফণি,
অবনী মণ্ডল হতে।
আর ধরাতল, কিছু হলাহল,
রহিবে না কোনমতে ॥
তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়,
তোমার নয়নে প্রাণ।
সে গরল পারে, সংহার সংসারে,
করিবারে সমাধান ॥

নারীরূপের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র কবিতায় যে বিশিষ্ট রীতি ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সেই রীতির অনেকটা পরিণত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৭ অর্থাৎ রজনী উপন্যাস পর্যন্ত রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ও কৌতুহলের আতিশয্য লক্ষিত, কিন্তু ১৮৭৮ অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে রূপবর্ণনায় তাঁর আশ্চর্য সংযমবোধের পরিচয় মেলে। ১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাগুলি প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে শুধু আদিরসের কবিতা না লিখে কিছু ভিন্ন রসের কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ললিতা' বা 'মানস' কাব্যে আদিরসের বালকোচিত প্রাবল্য নেই, ভাষা এবং উপমা প্রয়োগেও অনাবশ্যক প্রাবল্য প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'ললিতা' দুই সর্গে সম্পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র আখ্যানকাব্য। 'ললিতা' কাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে আদিরস-পরিবেশনের যথেষ্ট অবকাশ বা সুযোগ ছিল।

ললিতা তাহার নাম—রাজার নন্দিনী।
জননী না ছিল তার, বিমাতা বাঘিনী।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা;
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা।
দুর্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শুনে কেঁদে কেঁদে তার, চক্ষু যেন অন্ধ।
মন্মথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর,
বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর।
মোহিল ললিতাচিত তার দরশনে।
গোপনে বিবাহ হৈল মিলিল দুজনে।
জানিল বিবাহবার্তা দুরন্ত রাজন্।
কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন॥
এ পুরী আঁধার কেন কর কলঙ্কিনী।
শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী॥
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ।
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান॥
মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়।
ভয়ে ভীত দুইজনে নদী বেয়ে যায়॥

নদীপথে এবং তারপর এক গভীর নির্জন অরণ্য-প্রদেশের মধ্যে ললিতা ও মন্মথ কি ভাবে কয়েকটি দিবস ও রজনী অতিবাহিত করল তার চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীনির্মাণ-ক্ষমতার একটা প্রাথমিক পরিচয় লাভ করা যায়। এই কাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র ললিতা ও মন্মথের দৃষ্টিতে অরণ্য-প্রদেশের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু 'মানস' কাব্যে কবি নিজেই বলেছেন,

দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে॥
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে॥
চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে।
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্গে॥

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই কবিতার গোড়ায় বাল্মীকির শ্লোক এবং 'Childe Harold' কবিতা থেকে দুটি চরণ উদ্ধৃত করেন। প্রথমটি হল,

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যেব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥

'Childe Harold' থেকে উদ্ধৃতি,

There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.

'মানস' কাব্যে ভাবপ্রকাশে ও শব্দচয়নে কোথাও কোথাও বালকোচিত অপরিণতি থাকলেও মূলতঃ এই কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আন্তরিক প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় প্রকাশ পায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সকল কবিতাই ভাব ও প্রকাশরীতি—উভয় দিক থেকেই ছিল প্রাচীন কাব্যধারার অনুকারী; কিন্তু 'ললিতা' বা 'মানসে'র প্রকাশরীতি যেমনই হোক, ভাববস্তুর দিক থেকে উক্ত কাব্য দু-খানি আধুনিকতা দাবি করতে পারে। 'মানস' কবিতাটি পাঠকালে সমুদ্রের সৌন্দর্যদর্শনে অভিভূত নবকুমারকে অথবা কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের রচয়িতা কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে সহজেই মনে পড়ে।

এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রচিত কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন তাঁর পরিণত-বয়সের লেখা কবিতাগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৮৯১এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর পরিণত-বয়সের লেখা যে-সকল কবিতা সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি বঙ্গদর্শন 'ভ্রমর' ও 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১২৭৯র জ্যৈষ্ঠে। ওই বছরেই বৈশাখ থেকে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহিক উপন্যাস বিষবৃক্ষের সূত্রপাত। সুতরাং এই সময় এবং এর পরবর্তীকালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পরিমাণের দিক থেকে অধিক না হলেও, তাঁর পরিণত-বয়সের রচনা

হিসাবে কবিতাগুলির গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পর্বের কবিতাগুলিতে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোন ভাবগত ঐক্য বা সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত এবং বিভিন্ন বিষয়ক ভাবে সম্পূর্ণ। কোনটি ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা, কোনটি বা প্রেম সৌন্দর্য দেশাত্মবোধক কিংবা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা।

১২৭৯র জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটির নাম 'আকাঙ্ক্ষা'। পরিণত-বয়সের লেখা হলেও এই কবিতাটি তাঁর বাল্যকালের লেখা কবিতা গুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চৌদ্দ স্তবকে সম্পূর্ণ ওই কবিতার প্রথম সাত স্তবকে 'সুন্দরী'র আকাঙ্ক্ষা এবং অবশিষ্ট স্তবকগুলিতে 'সুন্দরে'র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

কবিতার সপ্তম স্তবকে রাধার উক্তি,

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর।
শ্যামল সুন্দর!

এই প্রসঙ্গে চতুর্দশ স্তবকে শ্যামের উক্তি,

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম সুখরত্নাকর?

১২৭৯র কার্তিকে বঙ্গদর্শনে 'বায়ু' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্য গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মত এটিকেও একখানি বৈজ্ঞানিক কবিতা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতায় বায়ুর উক্তি,

সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,

বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল করি,
স্নিগ্ধ করি কায় ॥
আমার সমান কেবা যুবতীমন ভুলায় ?

কিন্তু যুবতীমন ভুলানই এ কবিতার প্রধান রস নয়, কারণ কবিতার প্রথম চরণেই বঙ্কিমচন্দ্র বায়ুকে দিয়ে বলিয়েছেন,

জন্ম মম সূর্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে।

এবং অন্যত্র বায়ুর উক্তি,

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ?
আমি না থাকিলে ভুবনে ?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে।
উড়াই খগে গগনে।
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে।
আনিয়া সাগরনীরে,
ঢালে তারা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ?

কবি নিজেই 'উড়াই খগে গগনে' এই চরণটির শেষে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লিখেছেন, "*Vide* Reign of Law, by Duke of Argyll, Chap. VII. Flight of Birds"। লক্ষ্য করবার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কবিতা লেখেন, তার কিছু পূর্ব থেকেই তিনি বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞানরহস্যের প্রবন্ধগুলি রচনা শুরু করেন। বঙ্গদর্শনে ১২৭৯র জ্যৈষ্ঠে

'আশ্চর্য সৌরোৎপাত' শীর্ষক একখানি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের কোন কোন স্থানে বায়ু সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য আছে।

১২৭৯র অগ্রহায়ণে 'সাবিত্রী' শীর্ষক উনিশ স্তবকের একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় সতীসাধ্বী সাবিত্রী তার মৃতস্বামীর সঙ্গে কিরূপে অমর্ত্যলোকে যাওয়ার অনুমতি ও সুযোগ পেল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার দুর্গম বনের মধ্যে যেখানে সাবিত্রী একাকিনী তার মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে বসেছিল, কবিতার শেষ স্তবকে সেইস্থানে,

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরিযুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে॥

কবির এই বিশিষ্ট কল্পনা তাঁর বাল্যকালের 'ললিতা' কাব্যের উপ-সংহারেও দেখা যায়। এখানে যেমন সতী ও তার মৃতস্বামীর স্থানে 'জনমিল তথা দিব্য তরুবর', 'ললিতা' কাব্যে দেখি ললিতা ও মন্মথ মৃত্যুর পর বনমধ্যে দেবদারু বৃক্ষরূপে যুগলমূর্তিতে পুনর্জন্ম লাভ করল। মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু ও জীবনচর্চার সঙ্গে এই যে বৃক্ষের বিশিষ্ট কল্পনা—এটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নাম ও কাহিনীর মধ্যেও কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে 'বিষবৃক্ষ কি' তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখক বলেছেন, "যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি-সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত

করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়।" মনুষ্যজীবনের রিপু বা প্রবৃত্তিজনিত পাপের পরিণতি হল বিষবৃক্ষের জন্ম, এবং পুণ্য বা মঙ্গলকর্মের পরিণতি হল 'সুগন্ধি কুসুমে' শোভিত 'দিব্য তরুবর' রূপে প্রকাশ।

'বিরহিণীর দশ দশা' কবিতাটি বঙ্গদর্শনে ১২৭৯র ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই কবিতাটি তাঁর কাব্যগ্রন্থের কোন সংস্করণে সংযোজিত বা পুনর্মুদ্রিত করেন নি। কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গত কারণেই পুনর্মুদ্রিত করেন নি। এটি নিতান্তই একটি দুর্বল রচনা এবং প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের গর্ভিনীর দশ মাসের চিত্রের অনুসরণে রচিত।

১২৮০র বৈশাখ এবং কার্তিকে যথাক্রমে 'আদর' এবং 'মন এবং সুখ'—এই দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। দুটি কবিতাই সাধারণ প্রেমবিষয়ক। ভাব বা আঙ্গিকের দিক থেকে কোনরূপ মৌলিকতা বা বিশিষ্টতার প্রকাশ ঘটে নি। 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১র বৈশাখে 'জলে ফুল' নামক একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতার প্রথম স্তবক,

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

কবিতার শেষ স্তবক,

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।

এই কবিতাটি পাঠকালে সহজেই কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের অন্তর্গত 'বসন্তের কোকিল' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। পদ্যে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র জলস্রোতে

ভেসে যাওয়া একখানি ফুলের সঙ্গে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন, গদ্যে সেই মনের ভাব কোকিলের উদ্দেশে ব্যক্ত হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, 'জলে ফুল' কবিতাটি 'ভ্রমর' পত্রিকায় যে মাসে (১২৮১ বৈশাখ) মুদ্রিত হয়, 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধটি তার ঠিক পূর্ব মাসে (১২৮০ চৈত্র) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

'অধঃপতন সঙ্গীত' (বঙ্গদর্শন ১২৮১ অগ্রহায়ণ), 'ভাই ভাই' (বঙ্গদর্শন ১২৮১ চৈত্র), 'দুর্গোৎসব' (বঙ্গদর্শন ১২৮৫ ভাদ্র) এবং 'রাজার উপর রাজা' ('প্রচার' ১২৯২ বৈশাখ)—এগুলি মূলতঃ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা। কবিতাগুলির মধ্যে একই সঙ্গে বিদ্রূপ ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর অধঃপতনের চিত্র দেখে শুধু যে রসিকতা বা তিরস্কার করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে বাঙালীর দুর্বলতায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং দুর্বল ও অধঃপতিত বাঙালীকে কি করে নবীন সত্যে ও শক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তার পথের সন্ধান করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সঙ্গে এই কবিতাগুলির সাদৃশ্য বা প্রকৃতিগত মিল লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার অনেক পূর্ববর্তী বলে সময়ের বিচারে তাঁর কবিতার গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'অধঃপতন সঙ্গীতে' যেখানে বলেন,

কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্‌ চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে॥
শিখিয়াছি লেখাপড়া ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিলাত ফের্তা' কবিতায় সেখানে গান,

আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা'—আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি'।

কিংবা,

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই পর্যন্ত লিখে তাঁর কবিতা শেষ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র এর পরেও বাঙালীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন,

ছাড়ি দেহ খেলাধূলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যত দিন বাঙ্গালিকে লোকে ছিছি বলে॥

'সংযুক্তা' ও 'আকবর শাহের খোষরোজ' কবিতা-দুটি বঙ্গদর্শনে যথাক্রমে ১২৮৪ চৈত্র ও ১২৮৫ বৈশাখে প্রকাশিত হয়। 'সংযুক্তা' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র টডের রাজস্থান অবলম্বনে পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তা চরিত্রের মহিমা ও বীরত্ব বর্ণনা করেন। 'আকবর শাহের খোষরোজ' কবিতায় আর্যকন্যার শক্তি ও গৌরব বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি ব্যতীত পরিণত-বয়সে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ কবিতার মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ, দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধা, নব্য বাঙালীদের আচার-আচরণ ও চরিত্রদর্শনে বেদনা ও হতাশা এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি অনন্ত আশা ও আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম-বয়সের লেখা কবিতাগুলি যতই অপরিণত ও আদিরসাত্মক

হোক না কেন সেগুলির মধ্যে ভাবের ও চিন্তার একটা বিশেষ যোগসূত্র লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিতা রচনা করেন সেগুলির মধ্যে কবির গভীর প্রাণের অনুভূতির কোন বিশিষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কবিতা রচনা শুরু করেন তখনও তিনি উপন্যাসাদি রচনার কাজে হাত দেন নি; তাই দেখি প্রথম পর্বের কবিতার কিছু-কিছু ভাব ও উপকরণ পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। উপন্যাসের মধ্যে যে-সকল লক্ষণ বা বিশিষ্টতা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা কবি আখ্যা দিই, সেই কবিত্বের বীজ যে তাঁর প্রথম পর্বের কবিতাগুলির মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়েছিল— একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক কবিসত্তা কাব্যরচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পরবর্তীকালে তিনি যে-সকল কবিতা রচনা করেন সেগুলির বিষয় ও ভাবগত মূল্য যে-পরিমাণই থাক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিষয় বা ভাববস্তুকে যথার্থ কাব্যরসে সঞ্চারিত করে তুলতে সক্ষম হন নি। এই পর্বের কবিতাগুলিকে রসের বিচারে যথার্থ কবিতা আখ্যা না দিয়ে গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মনের বিবিধ চিন্তার একপ্রকার পদ্যভাষ্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা

১২৭৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম চার বৎসরের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। অর্থাৎ ১২৭৯র বৈশাখ থেকে ১২৮২র চৈত্র পর্যন্ত।

১২৮৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ থাকে।

১২৮৪ থেকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হন সঞ্জীবচন্দ্র। ১২৮৪র বৈশাখ থেকে ১২৮৫র চৈত্র, ১২৮৭র বৈশাখ থেকে ১২৮৮র আশ্বিন এবং ১২৮৯এর বৈশাখ থেকে চৈত্র—এই সময়কার বঙ্গদর্শনে সম্পাদকরূপে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হয়েছিল, যদিও সমকালীন বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে জানা যায় পত্রিকা সম্পাদনার প্রায় সকল দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বের মত নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ১২৮৯এর চৈত্র সংখ্যার পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১২৯০এর কার্তিক থেকে মাঘ—এই চারটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এর দীর্ঘকাল পরে ১৩০৮ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ—এই পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন[১] পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" কবি আরও বলেছেন, "আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে বাঙলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র একদা যে উদ্দেশ্যে তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রচার করেছিলেন তা সফল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও বুঝেছিলেন, "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন

১. এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৫ কার্তিক-পৌষ।

সম্ভাবনা নাই।" বাংলা ভাষার উন্নতির কথা অনুধাবন করা সে যুগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছিল। বঙ্গভাষা উন্নতির ইতিহাসে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের কথা বিস্মৃত হবার নয়। কিন্তু সমস্ত বাঙালী জাতিটাকে আপন মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বঙ্গভাষাচর্চায় সর্বপ্রথম গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে। বঙ্গদর্শনের পূর্বে বাংলায় যে পত্রপত্রিকার কিছু অভাব ছিল তা নয়। 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮) থেকে বঙ্গদর্শন-পূর্ববর্তী যুগের পত্রপত্রিকার তালিকা নির্মাণেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক-পত্র প্রথম খণ্ড' সম্পূর্ণ হয়েছে। কোনটি সাপ্তাহিক কোনটি মাসিক কোনটি দৈনিক। 'দিগ্দর্শন' ও বঙ্গদর্শনের মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ', রামমোহন ও ভবানীচরণের 'সম্বাদ কৌমুদী', ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা', ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইত্যাদি। বঙ্গদর্শন-পূর্ববর্তী অধিকাংশ পত্রিকাই মুখ্যতঃ বিশেষপক্ষের সমর্থনে বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ ইতিহাস আমাদের অপরিজ্ঞাত নয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'কে কিছু পরিমাণে বঙ্গদর্শন আবির্ভাবের প্রস্তুতিভূমি রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র উদ্দেশ্য যাই থাক তার আয়োজন ছিল ক্ষুদ্র। "এই পত্রের প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠা এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১॥০।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বলেছেন, "আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।" আর বলেছেন, "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জয় করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আশা এবং উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় হাত দিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন-পাঠক রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন, "অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।" বঙ্কিম বলেছেন কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন বা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গলসাধনের জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হয় নি। বঙ্কিম নিজেও অনুভব করেছেন তাঁর কালের প্রায় সকল পত্রিকাই কোন না কোন সম্প্রদায়ের মুখপত্র রূপেই প্রকাশিত হয়েছে। কেবল জ্ঞানচর্চা নয়, সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা চর্চায় বাঙালীকে প্রেরণা দানের দায়িত্ব নিয়ে সে যুগে কেউ এগিয়ে আসেন নি।

বঙ্কিম তাঁর পত্রিকার নাম দিয়েছেন বঙ্গদর্শন। কেন এই নাম ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। বঙ্গদর্শনের পূর্বে '-দর্শন' নামযুক্ত আরও দুটি চারটি পত্রিকার সন্ধান মেলে। যেমন প্রথমেই আছে 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮), তাছাড়া আছে 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২), 'জ্ঞানদর্শন' (১৮৫১), 'পরিদর্শন' (১৮৬৪) ইত্যাদি পত্রপত্রিকা। শুধু বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চার জন্য নয়, বাংলা দেশকে জানব বুঝব আবিষ্কার করব, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করব, বাংলা দেশকে বন্দনা করব—তাই পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন। কেউ কেউ দ্বিভাষিক বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরের (১৮৪২) সঙ্গে বঙ্গদর্শন-নামের সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গদর্শনে কি কি রচনা প্রকাশিত হত? উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা রসরচনা গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি। প্রবন্ধের মধ্যে ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব সংগীত ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধবিষয়ক রচনা থাকত।

বঙ্গদর্শনের মুখ্য লেখক ছিলেন সম্পাদক স্বয়ং। তাছাড়া আরও অনেকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম থাকত না। কোন কোন লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম আছে। যেমন—শ্রীঅঃ, শ্রীনঃ, শ্রীপূঃ, শ্রীযঃ, শ্রীরা, শ্রীরাজ, শ্রীলাল ইত্যাদি। খুব অল্প রচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয়েছে। কমলাকান্ত ছাড়াও মহামর্কট, ভজরাম, দর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড ইত্যাদি ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমের রচনাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে যতখানি পাওয়া যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার মধ্যে তাঁকে আরও বেশি করে আবিষ্কার করা সম্ভব বলে মনে হয়। বঙ্গদর্শন সম্পাদন না করলে তাঁর রচনার ধারা হয়ত ভিন্নতর হত। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পরেই তাঁর প্রবন্ধরচনাধারার সূত্রপাত ঘটে। ক্ষুদ্র উপন্যাস ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানী বা ক্ষুদ্রকথা রাজসিংহ বঙ্গদর্শনের তাগিদেই লিখিত হওয়া সম্ভব। আফিমখোর কমলাকান্ত চক্রবর্তীর জন্মও এই বঙ্গদর্শনেই। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমের চারটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি কাব্যগ্রন্থ—ললিতা; অপর তিনটিই উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী। বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাধারাও দ্রুত এগিয়ে যায়। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে বঙ্গদর্শন মাঝে-মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর রচনার গতিও স্তিমিত হয়ে আসত। বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণকান্তের উইলের সূচনা ১২৮২র পৌষ সংখ্যা থেকে। চৈত্রের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে উপন্যাসের ন'টি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছে। এরপর দীর্ঘ এক বৎসর পত্রিকা বন্ধ থাকা-কালে বঙ্কিম উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পারেন নি। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে কৃষ্ণকান্তের উইল আবার এগোতে থাকে। বঙ্গদর্শন-পর্বের পূর্বে প্রাবন্ধিক সমালোচক দার্শনিক চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একাধারে কবি, সমাজসংস্কারক, ঔপন্যাসিক, ভাবুক, স্বদেশভক্ত, সমালোচক, ধর্মোপদেষ্টা, দার্শনিক ইত্যাদি বিবিধ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। বঙ্গদর্শনকে এক হিসাবে বঙ্কিম-দর্শনরূপে অভিহিত করা যায়।

নবীনচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বঙ্গদর্শনের তিনভাগ লেখাই তাঁকে লিখতে হত। এ উক্তি তথ্যের বিচারেও অতিশয়োক্তি নয়। একই সংখ্যায় তাঁকে বঙ্গদর্শনের প্রয়োজনে উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা দিতে হত। সেই সঙ্গে কোন কোন সংখ্যায় কবিতাও সংযোজিত হত।

বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থভাবে তৎকালের সাহিত্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত মন্তব্য এ প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। তাঁর উক্তি, "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি

লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" বঙ্গদর্শনের সমালোচনা সেকালের লেখকদের মনের ওপর কিভাবে এবং কতখানি প্রভাব বিস্তার করত তা সন্ধান করবার মত। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থাদির যে সমালোচনা হইত, তাহাতে প্রশংসার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আর যাঁহারা অনুপযুক্ত তাঁহারা বাধ্য হইয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্বক উপযুক্ত পথগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন।...সকলেই বঙ্গদর্শন সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত, তিনি যে-গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিতেন রাশি রাশি পাঠক তাহা অবিলম্বে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারকে পরোক্ষভাবে প্রোৎ-সাহিত করিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে-গ্রন্থের নিন্দা করিতেন, সে গ্রন্থ বড় কেহ কিনিত না। পুস্তক বিক্রেতার দোকানে তাহা কীটদষ্ট হইয়া জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। বড় সহজ কি এই শক্তি! কিন্তু বঙ্গদর্শন একদিন তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা প্রভাবে, সর্বোপরি পক্ষপাতশূন্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনা-বশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন সাহিত্যজগতে এইরূপই রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিল।" বঙ্গদর্শনে সমালোচনার স্বরূপ কি রকম ছিল তা পূর্বের একটি অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সকল লেখকের ওপরেই বঙ্কিমের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল। এক হিসাবে নিজের পত্রিকার লেখকদের রচনারও তিনি কঠিন সমালোচক ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন, "কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এদিকে বড় উদাসীন। তোমাদের সাহিত্যেও দেখি, অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে, বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন?' আমি বলিলাম, 'আমরা পারি না; জানি না। আপনা আপনির লেখা দেখিয়াও দিই। তাহার পরও ঐরকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহস হয় না।' বঙ্কিমবাবু, 'তাহা হইলে কেমন

করিয়া কাজ চলিবে? এইজন্যই বঙ্গদর্শনের আমলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া রিভাইজ না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না।" বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ লেখককেই যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় নিজ হাতেই তৈরি করে তুলেছিলেন—তা বলা যায়। লেখক তৈরির কাজ যে কেবল বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদে থাকাকালেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালেও বঙ্কিম তাঁর স্বীয় দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন।

বঙ্গদর্শনের অন্যতম বিখ্যাত লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল।" বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের গৌরব কি সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে অক্ষুণ্ণ ও অম্লান ছিল? তার প্রতিপত্তি কি আগের মতই সমপরিমাণ ছিল? এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি, "বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী' তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্যাধ্যক্ষতার কার্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।…

শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।" সেটা তখন ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস।

এরপরেও বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশ ঘটে। চন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১২৯০এর কার্তিক মাসে বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রকাশিত হল। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন, "আমার বঙ্গদর্শন-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, 'শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে তা হবে না।' আমি বলিলাম, 'বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল বরাবর ত চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে।' উত্তর—'নবেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব ন-মাসে ছ-মাসে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবা পুরুষ, অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজদাদাও খান।··· সে বারে দুই মাস বঙ্গ-দর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।' আমি বলিলাম, 'আপনি কেন সম্পাদক হোন না?' উত্তর—'আর আমার সে উৎসাহ নাই।'··· আর একদিন চন্দ্রনাথবাবু বঙ্গদর্শনের কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, 'শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।' বঙ্কিমবাবু অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'তা হলে বঙ্গদর্শন ছাড়িব কেন? তা হলে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না।" যাই হোক, শ্রীশচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১২৯০এর কার্তিক থেকে মাঘ—এই চার মাস মাত্র চলেই বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীশচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমেরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। তাঁরই নির্দেশে মাঘ মাসের পর বঙ্গদর্শন আর প্রকাশিত হয় নি।

বঙ্কিমের নির্দেশেই যে বঙ্গদর্শনের প্রচার বন্ধ হয়, সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমের একখানি চিঠি থেকে (তারিখ ২৩ ফেব্রুঅরি ১৮৮৪) তা জানতে পারি। পত্রে আছে, "শ্রীচরণেষু—অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন। পত্র পাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন।" এর দীর্ঘকাল পরে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়।

সংযোজন

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, যে-সময় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়, সেই-সময়কার বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত কতকগুলি ইংরেজি চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে লেখকের পত্রিকা-চিন্তার নানা সূত্র আবিষ্কৃত হয়। চিঠিগুলি Mookerjee's Magazineএর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। রচনাকাল ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলি সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক Bengal : Past and Presentএ (এপ্রিল-জুন ১৯১৪) সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণ Essays and Letters গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস চিঠিগুলি পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮৭২এ শম্ভুচন্দ্র তাঁর পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করেন। এই পত্রিকায় প্রথম থেকে বঙ্কিমকে কিছু লেখবার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমও এই সময় বঙ্গদর্শন প্রকাশের কাজে ব্যস্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিগুলির মধ্যে যে-সকল অংশে তাঁর বঙ্গদর্শন সম্পর্কিত চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে এখানে সেই অংশগুলি সংকলিত হল।

১.

Berhampore
The 14th March [1872]

I wish you every success in your project. [Mookerjee's Magazine পুনঃপ্রকাশ প্রসঙ্গ] I have myself projected a Bengali Magazine [বঙ্গদর্শন] with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be; I think that we ought *to disanglicise* ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand. I therefore project a Bengali Magazine. But this is only half

the work we have to do. No purely vernacular organ can completely represent the Bengali culture of the day. Just as we ought to address ourselves to the masses of our own race and country, we have also to make ourselves intelligible to the other Indian races, and to the governing race. There is no hope for India until the Bengali and the Punjabi understand and influence each other, and can bring their joint influence to bear upon the Englishman. This can be done only through the medium of the English, and I gladly welcome your projected periodical. But I have thought it necessary to give you my ideas on the subject of an Anglo-Bengali literature at length, because you will find me singing to a different tune on other occasions, on the principle that each side of a question must be put in its strongest light, specially when we have to fight against a popular one.

After this, I need not tell you that I shall not want in inclination to co-operate with you, and if my literary services are worth enlisting on your side, they are at your disposal. It is true I am likely to be a little overworked at present, owing, not to my literary engagements, but to a reduction in the number of officers at our Station, but I will nevertheless make time both for your Magazine and mine.

২.

Berhampore
May 13, 72.

Many thanks for your kind opinion of my periodical. I was rather disappointed to find that the *Patriot* [The

Hindoo Patriot] contained no review of it, specially as I had requested my publisher to send out presentation copies to no Editors except yourself. My publisher has not I find strictly acted up to my wishes.

My pot-bellied reviewer comes out strong under the disguise of an anonymous correspondent—as he did on previous occasions when he had to review my books. On this occasion, however, it is possible that the writer is a genuine correspondent, for the review has very much the appearance of having been written by some lad who has yet his Entrance Examination test to pass. You will hardly find it worthy of being replied to in the columns of the *Patriot*, but nevertheless I have asked my publisher to send you the paper, if only to enable you to teach the Editor a lecture on the impropriety of addmitting silly communications which disgrace journalism....

Your remarks on the getting [up] of the *Banga Darsana*, I have communicated to the manager. He must improve. Poor Dinabandhu [দীনবন্ধু মিত্র] is not responsible for that feeble article on our costume. It was from another celebrity, whom I was obliged to humour.

When do you bring out your first issue ? I have got the prospectus. I hope to commence a tale in your Magazine, as soon as I get my contributors to work in earnest. I hope to be in time for your second issue. Pray, try to enlist Raj Krishna Mukerjee, M. A., of the High Court Bar, one of our most promising young men. Babu Gooroo Churan Dass, Depy. Magistrate may be of use to you, if you ask him.

Berhampore
Sept. 4, 72.

Kindly excuse the long delay which has taken place in replying to you. At first something or other made me put off the reply—and then came a long and serious illness, from which I have just been freed.

I would have redeemed my promise and contributed my humble mite to your Maga [zine] but for my illness. All brain-work is prohibited to me at present, so much so that I have been obliged to make over my own Maga [zine] to a friend, *pro tem.*

৪.

Berhampore
28th December [1872]

Now, let me know what I shall write. Stories ? But you seem to have enough of them, and one serial story like Bhubaneswari [রাসবিহারী বসু লিখিত] is enough for one Maga [Mookerjee's Magazine] : Shall it be a review ? I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonia against *Mookerjee.* That is why *Banga Darsan* has so little of politics in it.

৫.

Berhampore
The 19th Jany. [1873]

There are three good libraries in Berhampore, and I have got the books I wanted, but have been unable to make the use of them I intended from [want] of time. I have been busy writing the *Banga Darsan* for Falgun. I have, therefore, been unable to finish my paper intended for *Mookerjee.*

বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে সেযুগে এমন একটি লেখকমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল, যে-গোষ্ঠী উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনা রস-রচনা—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখনী সঞ্চালন করে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সহসা বাল্যকাল থেকে যৌবনে উপনীত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও মন্তব্য করেছেন, "কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল" এবং সেই লেখকমণ্ডলীর "লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ।" বর্তমান অধ্যায়ে নয় বৎসরের বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী ও তাঁদের রচনাধারার পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা গেল।

রা জ কৃ ষ্ণ মু খো পা ধ্যা য়। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকে একই সঙ্গে কবি ও প্রাবন্ধিকরূপে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আবির্ভূত হন। ১৮৭২এর পূর্বেই রাজকৃষ্ণের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রূপককাব্য 'যৌবনোদ্যম' প্রকাশকাল ১৮৬৮, 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্যকবিতা' ১৮৬৯, 'কাব্যকলাপ' ১৮৭০ এবং গদ্যগ্রন্থ 'রাজবালা' ১৮৭০। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনে লেখকরূপে আবির্ভূত হবার পূর্বেই রাজকৃষ্ণ সেযুগে একজন কৃতী কবিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনই রাজকৃষ্ণকে বাংলা সাহিত্যের এক সুপণ্ডিত সমালোচক ও প্রাবন্ধিকরূপে চিহ্নিত করে দেয়। বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের দু-একটি কবিতা প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধ-লেখকরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ যখন প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত সেই সময়েই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।"

বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই প্রধান। গদ্যরচয়িতারূপে রাজকৃষ্ণের দ্বিবিধ পরিচয় বঙ্গদর্শন থেকে লাভ করা যায়। যে রাজকৃষ্ণ কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধের রচয়িতা; তিনি যে আবার 'কোমৎ দর্শন', 'দেবতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক ভ্রম', 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' ইত্যাদি প্রবন্ধের লেখক, ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে যে ভাবৈশ্বর্য ও কল্পনানিবিড়তার প্রতিশ্রুতি মিলেছিল, তাঁর স্বাধীন রচনাগুলিতে তা সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করলেই বোঝা যায় তিনি বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখক হয়েও বঙ্কিম-পূর্ববর্তী যুগের জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে নিবন্ধ রচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম রসধারার স্থান থাকতে পারে সে বিষয়ে রাজকৃষ্ণ কখনই তেমন সচেতন ছিলেন না। রাজকৃষ্ণের মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রাবল্য যতটা ছিল, রসবোধ ও ভাবুকতা সে পরিমাণে ছিল না। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাজকৃষ্ণ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিশুদ্ধ রসরচনা অপেক্ষা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনাতে সবিশেষ আগ্রহশীল হয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলি হল: 'জ্ঞান ও নীতি', 'কোমৎ দর্শন', 'ভাষার উৎপত্তি', 'ভাষা সমালোচন', 'প্রতিভা', 'কার্যকারণ সম্বন্ধ', 'শ্রীহর্ষ', 'চার্বাক দর্শন', 'ঐতিহাসিক ভ্রম', 'দেবতত্ত্ব', 'ভারত মহিমা', 'সমাজ বিজ্ঞান', 'বিদ্যাপতি', 'মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ', 'সভ্যতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষ'। লেখক ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইতিহাস বা দর্শনবিষয়ক। কখন তিনি প্রাচীন বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন, কখন মানবসভ্যতা ও মানবসমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন, কখন বা পুরাণব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি রাজকৃষ্ণ পরে তাঁর 'নানা প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলন করেন। 'নানা প্রবন্ধ' ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুটি মাত্র রচনা সাহিত্যবিষয়ক। এক 'বিদ্যাপতি' ও দুই 'শ্রীহর্ষ'। কিন্তু এ দুয়ের কোনটিই সাহিত্যের বিচার নয়—তা হল মূলতঃ ইতিহাসের বিচার। কবি বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় রাজকৃষ্ণেরই আবিষ্কার এবং শ্রীহর্ষেরও দেশ কাল পরিচয় আবিষ্কারে লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধের ভাষা সরস এবং মনোহর না হতে পারে কিন্তু তা অনাড়ম্বর স্পষ্ট ও ঋজু। বঙ্কিমের প্রবন্ধরীতি অনুসরণেই লেখক তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের উপসংহারে সূত্রাকারে বক্তব্যের সারসংক্ষেপ বিবৃত করেছেন। তাঁর সকল প্রবন্ধের মধ্যেই সত্যানুরাগ ও যুক্তিবাদী মননের পরিচয় বর্তমান।

পূর্বেই বলেছি রাজকৃষ্ণ কবিরূপেই সাহিত্যে প্রথম আবির্ভূত হন এবং বঙ্গদর্শনেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর রচিত 'বাঙ্গালার সাহিত্য' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ ফাল্গুন) রাজকৃষ্ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ, ইংরেজি সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্ সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলী পরিপূর্ণ।"

১২৮৯এর কার্তিকে রাজকৃষ্ণের যে 'মেঘদূত' পদ্যানুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তা বঙ্গদর্শনে অগ্রহায়ণেই সমালোচিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সমালোচনায় রাজকৃষ্ণের কবিকৃতি ও অনুবাদকর্মের উচ্চপ্রশংসা করেন।

বঙ্কিম তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসখানি রাজকৃষ্ণকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রে বঙ্কিম লিখেছেন, "সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।" রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, আর 'সীতারাম' পুস্তকাকারে প্রকাশিত ১৮৮৭র মার্চ মাসে।

রা ম দা স সে ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরাতত্ত্ববিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে যে ক'জন মনীষী খ্যাতিলাভ করেছিলেন রামদাস সেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামদাস সেনের পূর্বে পুরাতত্ত্ব গবেষণায় যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলাল ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় পুরা-তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন। অপর দিকে রামদাস সেন তাঁর সকল গবেষণা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করে পুরাতত্ত্ববিষয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় রামদাস সেনও বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে প্রবন্ধ-লেখকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্বে রামদাসের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলি হল: 'তত্ত্বসঙ্গীত লহরী'

(১৮৫৯), 'কুসুম মালা' (১৮৬১), 'বিলাপতরঙ্গ' (১৮৬৪), 'কবিতা লহরী' (১৮৬৭) এবং 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' (১৮৬৭)। বঙ্গদর্শনেই রামদাসের গদ্যরচনার সূত্রপাত, কিংবা বলা চলে পুরাতত্ত্ববিদ্ রামদাস বঙ্কিমচন্দ্রেরই আবিষ্কার। রামদাসের প্রথম যে-দুটি গদ্যনিবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় তা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকে রামদাস লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রথম বর্ষেই তাঁর চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত' (বঙ্গদর্শনে রামদাসের প্রথম রচনা—১২৭৯র শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত) ও 'কালিদাস' (১২৭৯র অগ্রহায়ণ)—এই প্রবন্ধ দুটি লেখক স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে প্রকাশ করেন।

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় রামদাস কোনসময়েই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমতকে একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন নি। সর্বদাই তাঁর গবেষণাধর্মী মন জাগ্রত ছিল এবং ভারতীয় গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি থেকে তিনি নূতনতর তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রামদাসের বহুসংখ্যক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখকের বিবিধ বিষয়ে গভীর কৌতূহল ও প্রবল জ্ঞানানুসন্ধান প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের প্রায় সকল রচনার মধ্যে একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও সহজ রসবোধের পরিচয় মেলে। আলোচনার বিষয়বস্তু নীরস এবং দুরূহ হলেও লেখকের লিপিকৌশল ও রসবোধের সম্মিলনে তা সর্বদাই পাঠকের আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রামদাসের লেখা পছন্দ করতেন এবং বঙ্কিমের অনুরোধেই রামদাস একটির পর একটি করে বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় রামদাস যে সর্বদা সংস্কারহীন যুক্তিবাদী মন এবং তথ্যনিষ্ঠ উপাদান ও প্রমাণের ভিত্তিতে সবকিছু বিচার করতে চেয়েছেন তা লেখকের একটি উক্তি থেকেই অনুধাবন করা যায়। 'কালিদাস' প্রবন্ধে রামদাস সেন লিখেছেন :

"আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রী পূঃ বর্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে-বিষয় খণ্ডন হইতেছে এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু

আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়।"—বঙ্গদর্শন ১২৭৯ অগ্রহায়ণ।

'কালিদাস' ব্যতীত বঙ্গদর্শনে রামদাস-প্রণীত জীবনবৃত্তান্তমূলক অপর যে ক'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলি হল 'শ্রীহর্ষ', 'বররুচি', 'হেমচন্দ্র' ও 'বাণভট্ট'। 'শ্রীহর্ষ' বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ষের বৈশাখে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীহর্ষ' প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করে রামদাসের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। রামদাসের মতে শ্রীহর্ষ দুইজন—একজন রত্নাবলীর রচয়িতা, অপরজন হলেন নৈষধকার। রাজকৃষ্ণ এই মত সমর্থন না করে রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষের ভিন্নতর পরিচয় দেন। তৃতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রামদাস রাজকৃষ্ণের আলোচনার উত্তর দেন।

বঙ্গদর্শনে রামদাসের আরও যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলির নাম নির্দেশিত হল: 'বেদ', 'বেদ প্রচার', 'বেদ বিভাগ', 'জৈনধর্ম', 'জৈনমত সমালোচন', 'বৌদ্ধধর্ম', 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন', 'পালিভাষা ও তৎসমালোচন', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ', 'সাহসাঙ্ক চরিত', 'আর্যগণের আচার ব্যবহার', 'হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র', 'ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র', 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়', 'রত্নরহস্য', 'রত্নতত্ত্ব', 'রত্নালঙ্কার' ও 'রাগনির্ণয়'।

রামদাস সেনের এই প্রবন্ধগুলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঐতিহাসিক রহস্যে'র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগে ও 'রত্নরহস্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রথম ভাগ ১২৮১, দ্বিতীয় ভাগ ১২৮২, তৃতীয় ভাগ ১২৮৫ এবং 'রত্নরহস্য' ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে 'ঐতিহাসিক রহস্যে'র প্রথম ভাগ সমালোচিত হয়েছিল। পত্রিকা-সমালোচক লিখছেন:

"অল্লাংশ ভিন্ন এই গ্রন্থ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত বলিয়া আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। কেননা, ইহার প্রশংসা করিলে একপ্রকার আত্মপ্রশংসা করিতে হয়। বিশেষ, এই সকল প্রবন্ধ প্রথমে এই পত্রের সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে

রামদাসবাবু একজন বিখ্যাত লেখক এবং পুরাবৃত্তবেত্তা। এবং এই সকল প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল।"—বঙ্গদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ।

রামদাস সেনের পুরাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। ইটালির ফ্লোরেনটিনো অকাডেমি রামদাসকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতপ্রেমিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার কর্তৃক লেখক প্রশংসিত হন। রামদাস সেনকে লিখিত ম্যাক্সমূলারের একটি পত্র 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পত্রটি উদ্ধৃত হল :

"Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God, Whom all men ignorantly worship, and Whom all very truly and wisely seive by doing what is just and good."

রামদাস তাঁর 'ঐতিহাসিক রহস্য' প্রথম খণ্ড 'ভট্ট মোক্ষমূলর'কে উপহার দেন।

বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি 'পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে' উৎসর্গ করেন।

অ ক্ষ য় চ ন্দ্র স র কা র। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করি। বঙ্গদর্শন প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশনাথ রায়কে লিখেছেন :

"I have got a lot of contributors, who have promised to write and can write, in Dinabandhu, Hemchandra, Krishnakamal Bhattacharjya, Taraprasad Chatterjee and a young man whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced, for good or for evil, and whose inherent gifts presage something great for him in future. His name is Akkhay Sarkar."

বঙ্গদর্শন যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অক্ষয়চন্দ্রের বয়স মাত্র বাইশ

বৎসর। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্রের লেখা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা' প্রকাশিত হল।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ-মুহূর্তের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর 'উদ্দীপনা' নামক উক্ত রচনাটির কথাও উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি, "কতদিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খ্রীষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশক-রূপে, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। লেখকগণের নাম বাহির হইল—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আর সকলে নামজাদা আমিই কেবল নাম-হীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুশি। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল।"

বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়: 'উদ্দীপনা', 'গ্রাবু', 'তুলনায় সমালোচন', 'দশমহাবিদ্যা', কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত 'চন্দ্রালোকে' এবং 'মশক'। এ ছাড়া বঙ্গদর্শনে লেখকের আর কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছিল কি না, কিংবা সেগুলি কি কি সেকথা বলবার মত কোন প্রমাণ বর্তমানে নেই। বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগে অক্ষয় সরকারও একজন সমালোচক ছিলেন। 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক অর্থাৎ আমি বাড়ি বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, 'সাধারণী' প্রকাশিত হইল, আর সেই মাস হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম।" এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় না যে, এই সময়ের পরবর্তী 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগের সকল পুস্তকের সকল সমালোচনাই একা অক্ষয় সরকারের রচিত, বঙ্কিম বা বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর অপর কারও নয়। এ উক্তির উপর নির্ভর করে কোনও একটি সমালোচনাও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করবার উপায় নেই যে—এটি অক্ষয় সরকারের সমালোচনা। অক্ষয়

সরকারের উক্তি থেকে এটুকুই কেবল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, বঙ্গদর্শনের সমালোচনা বিভাগে তিনিও একজন লেখক ছিলেন। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে এর অধিক কোনপ্রকার নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অক্ষয় সরকারের এই উক্তির ভিত্তিতে কালিদাস নাগ সম্পাদিত 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার' গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পুস্তক-সমালোচনা অক্ষয় সরকারের রচনা বলে সংকলিত হয়েছে। এভাবে রচনা সংকলন সঙ্গত নয়। মনে রাখা আবশ্যক, বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগের অন্তর্গত কোন একটি রচনাও অক্ষয় সরকার তাঁর স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে যাননি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম 'শিক্ষানবিশের পদ্য'। নাম থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে এটি একখানি কবিতা পুস্তক। প্রকাশকাল ভাদ্র ১২৮১। বঙ্গদর্শনে ১২৮১র আশ্বিনে গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার প্রথম কয়েক ছত্রে আছে, "শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন যে, অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার এইমাত্র বলিব যে, বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু গদ্যে যাদৃশ অদ্ভুত শক্তিশালী পদ্যে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শিক্ষানবিশের পদ্য, তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত পরিচয় নহে। তবে, ইহা 'শিক্ষানবিশের পদ্য'। শিক্ষানবিশের জন্য প্রণীত, এবং অক্ষয়বাবু যখন নিজে শিক্ষানবিশ ছিলেন, তৎকালে প্রণীত।"

বঙ্গদর্শনে যখন এই সমালোচনা লিখিত হয়, তার পূর্বে অক্ষয় সরকারের কি কি রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? 'উদ্দীপনা', 'গ্রাবু', 'তুলনায় সমালোচন' ও 'দশমহাবিদ্যা'—এই প্রবন্ধ চারটি 'শিক্ষানবিশের পদ্য' সমালোচনার পূর্বে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বঙ্গদর্শনের সমালোচক এই প্রবন্ধ ক'টিকে উপলক্ষ্য করেই গদ্যলেখক অক্ষয় সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। লেখকের 'সমাজ সমালোচন' শীর্ষক পুস্তকটি ১২৮১র পৌষে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে 'উদ্দীপনা' ও 'গ্রাবু' এই প্রবন্ধ দুটি সন্নিবেশিত হয়। 'উদ্দীপনা'

প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য, "প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা বা অন্যকে কার্যে লওয়ান যায়, তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা কবিতা হইতে পৃথক। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দেশ্য, রসাত্মিকা কথা। নির্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি, অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়।" বিষয়টি লেখক ভারতবর্ষীয় সমাজের পটভূমিতে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 'গ্রাবু' প্রবন্ধটি রূপকধর্মী রচনা। লেখকের মতে "তাস খেলা এই জটিল সংসারের অতি সুন্দর অনুলিপি।" তাস খেলার বিচিত্র পদ্ধতি ও কৌশলের রূপকে লেখক সমাজ-জীবনের নানা চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রবন্ধ রচনার এক বৎসর দুই মাস পর বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরের সূত্রপাত। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের রচনাতেই দপ্তরের রচনাপ্রণালীর পূর্বাভাস মেলে। 'গ্রাবু' প্রবন্ধটি কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত 'মনুষ্য ফল', 'বড়বাজার', 'বিড়াল' প্রভৃতি প্রবন্ধের সমশ্রেণী ভুক্ত। শুধু রচনাভঙ্গীর দিক থেকে নয়, ভাবকল্পনার দিক থেকেও 'গ্রাবু'র সঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তরের রচনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'গ্রাবু'র রচনাপদ্ধতি 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধেও অনুসৃত হয়েছে। এখানে লেখক বলেছেন, "আমার বোধ হয় যে এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশ মহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধূমাবতী মূর্তি।"—বঙ্গদর্শন ১২৮০ আশ্বিন।

'তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধটি ১২৮০র বৈশাখে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর বিরোধিতার সূত্রপাত অক্ষয় সরকারের এই রচনাটির মধ্য দিয়েই। যদিও কবি ভারতচন্দ্রই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তথাপি লক্ষ্য করা যায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রচনায় আক্রান্ত হন। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ ও নির্দেশেই অক্ষয় সরকার এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ধারাবাহিক উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা' ব্যতীত স্বদেশ সমাজ সাহিত্য ইতিহাস ধর্মনীতি শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধবিষয়ে হরপ্রসাদের বহু সংখ্যক সমালোচনা ও প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের নাম 'ভারতমহিলা'। পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের মাঘ ফাল্গুন ও

চৈত্র এই তিন সংখ্যায় প্রকাশিত। বস্তুতঃ এটি হরপ্রসাদেরও প্রথম বাংলা রচনা। সংস্কৃত কলেজের বি. এ. ক্লাসের যখন ছাত্র সেই সময় হরপ্রসাদ এই প্রবন্ধটি রচনা করে হোলকার পুরস্কার লাভ করেন। এই রচনাটির সূত্রেই হরপ্রসাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একদিন হরপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ যা লিখেছেন তা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, "রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে। অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, কি কাজ? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা।" যাই হোক হরপ্রসাদের প্রথম রচনাই বঙ্কিমকর্তৃক মনোনীত ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদ নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশের সন্তান ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, এই কারণে বঙ্কিম তাঁকে 'সংস্কৃতওয়ালা' বলে উল্লেখ করলেও হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনে প্রমাণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে সংস্কৃত-পণ্ডিতের ন্যায় গুরুগম্ভীর ভাষার প্রতি পক্ষপাত এবং দুরূহবিষয়ের দুরূহতর উপস্থাপন-প্রবণতার প্রতি আগ্রহ একেবারেই ছিল না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রথম রচনা 'ভারতমহিলা'য় হরপ্রসাদ একাধারে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে যেমন সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, সেইরূপ তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও মার্জিত ভাষাজ্ঞানেরও নিদর্শন রেখে গেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় নারী চরিত্রের এক উচ্চআদর্শ সন্ধান করতে গিয়ে যেমন বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন সেইরূপ সংস্কৃত ক্লাসিক-সাহিত্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন স্ত্রীচরিত্রের সূক্ষ্মতম বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের প্রথম রচনাতেই একজন যথার্থ ইতিহাসরসিক ও সাহিত্যরসজ্ঞ প্রকৃত বাঙালী লেখকের সন্ধান পেয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারতমহিলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (২০ জুন ১৮৮১)। বঙ্গদর্শনে ১২৮৭র চৈত্র সংখ্যায় 'ভারতমহিলা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষের পর থেকে প্রতি বৎসরই প্রায় নিয়মিতভাবে হর-প্রসাদের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালার সাহিত্য', 'নূতন কথা গড়া' ও 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। 'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র' এবং 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত তুলনামূলক সমালোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'বাঙ্গালার সাহিত্য' প্রবন্ধটি লেখক প্রথমে সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক সম্মিলনে পাঠ করেন, পরে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ধারাবাহিক আলোচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলমণি বসাক, টেকচাঁদ ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ লেখকগণ হরপ্রসাদের আলোচনার অন্তর্গত। এই প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আলোচনা করেছেন। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শন পত্রিকার গুরুত্ব ও স্থান কতখানি —তাও নির্দেশ করেছেন।

বাংলা ভাষা কি পদ্ধতিতে লিখিত হওয়া উচিত, নূতন ভাব প্রকাশ করতে গেলে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কেবল কি বাংলা শব্দই গ্রহণ করব, না প্রয়োজন হলে হিন্দী ওড়িয়া সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করব—ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধটি। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধেও লেখক বাংলা রচনাপ্রণালীর আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিখ্যাত মহাকবির কবিপ্রকৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। কালিদাস হলেন বহিঃপ্রকৃতির কবি, বাহ্যজগতের সৌন্দর্যবর্ণনায় তিনি যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, মনুষ্যহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি তদ্রূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অপরদিকে শেক্সপীয়র হলেন অন্তঃপ্রকৃতির কবি, এইখানেই তাঁর সাফল্য; বহির্জগতের সৌন্দর্যবর্ণনায় তিনি কালিদাসের ন্যায় তাদৃশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। হরপ্রসাদের উক্তি:

"বাহ্যজগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। শেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর, তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রতিভা।"—বঙ্গদর্শন ১২৮৫ বৈশাখ।

হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। ১২৮০র পৌষ সংখ্যায় 'মানসবিকাশ' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি ও জয়দেবকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মাপকাঠিতেই তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। হরপ্রসাদ বঙ্কিমের প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই কালিদাস ও শেক্সপীয়রের কবিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করেন। হরপ্রসাদ তাঁর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধে কালিদাস বায়রন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি এবং সেদিনকার বাঙালী ছাত্র ও তরুণসম্প্রদায়ের উপর উক্ত তিন কবির আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ রসবোধের পরিচয় লাভ করা যায়।

হরপ্রসাদের রচিত 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' পুস্তকটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক জানিয়েছেন, "অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।" ১২৮৯এর বঙ্গদর্শনে অগ্রহায়ণ পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় হরপ্রসাদ মেঘদূতের ব্যাখ্যার সূচনা করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মেঘদূত-অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গেই হরপ্রসাদ স্বতন্ত্রভাবে মেঘদূত ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হন। এই সমালোচনায় লেখক মেঘদূতের কাহিনী, ঘটনা, রচনাপ্রণালী এবং কাব্যের সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য', 'শিক্ষা' ও 'কালেজি শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য। লেখকের মতে প্রকৃত শিক্ষা হল তা-ই, যা মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সর্ববিধ সামাজিক কল্যাণসাধনে মনুষ্য-চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করে তুলবে। এই আদর্শের ভিত্তিতেই লেখক তাঁর শিক্ষা ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলি রচনা করেন।

এই সকল প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদ বিবিধবিষয়ে আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যে সকল রচনার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাধর্মী মননের পরিচয় পাওয়া যায় অপর দিকে তেমনি একজন সমাজ সচেতন রসজ্ঞ ব্যক্তিরও সন্ধান মেলে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'আমাদের গৌরবের দুই সময়', 'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ', 'বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা', 'শঙ্করাচার্য কি ছিলেন?', 'একস্‌চেঞ্জ', 'একজন বাঙ্গালী

গভর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব', 'তৈল', 'খাজনা কেন দিই', 'নূতন খাজনা আইন', 'স্বাধীনবাণিজ্য ও রক্ষাকর' প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। লেখকের দীর্ঘ রচনা 'বাল্মীকির জয়' বঙ্গদর্শনের তিন সংখ্যায়, ১২৮৭র পৌষ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে কিছু পরিবর্ধিত হয়ে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ১২৮৮র আশ্বিনে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় গ্রন্থটি সমালোচিত হয়েছিল। সমালোচনার অন্তর্গত কয়েকটি ছত্র :

"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকলস্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণসকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই।...কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমময়ী। যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেকথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন আমাদের স্মরণ হয় না।"—বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন।

বঙ্গদর্শনে 'বাল্মীকির জয়' যখন সমালোচিত হয় তখন হরপ্রসাদের বয়স আটাশ বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' উপন্যাস নামে প্রকাশিত হলেও মূলতঃ তা ছোটগল্প। হরপ্রসাদের একটি মাত্র উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনের নবম বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাঞ্চনমালা এই উপন্যাসের নামচরিত্র। সে মহারাজা অশোকের পুত্র কুণালের স্ত্রী। উপন্যাসটি অশোকের অন্যতমা মহিষী তিষ্য-রক্ষিতা কর্তৃক নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী। সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলার পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশক্তির মধ্যে সংঘাত এবং শেষে বৌদ্ধশক্তির জয়—লেখক তাঁর উপন্যাসে

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের বহু স্থানেই বঙ্কিম-প্রভাব সুস্পষ্ট। 'কাঞ্চনমালা' অবশ্যই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, সার্থক উপন্যাসও নয়; তবে হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের কাহিনী অবলম্বন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমিকে যেভাবে বিস্তৃততর করে গেছেন তা তাঁর যথার্থ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকেই বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদর্শনে তাঁর প্রথম রচনাটির নাম 'যাত্রা'। বাংলা দেশের যাত্রাভিনয় সম্পর্কে একটি মনোরম আলোচনা। রচনাটি দুই সংখ্যায় মুদ্রিত। প্রথম অংশটি ১২৭৯র পৌষে এবং দ্বিতীয় বা অবশিষ্ট অংশটি ১২৮০র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় লেখক 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা' করেন এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখক যাত্রার অভিনয়কলা এবং তার নৃত্যগীতাদির দিকটি পর্যালোচনা করেন। 'পালামৌ' রচনার সাত বৎসর পূর্বেই গদ্যশিল্পী সঞ্জীবচন্দ্রের কৌতূহলী রসিক মনটি বর্তমান রচনায় আভাসিত।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত 'বৈজিকতত্ত্ব' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনাটি বঙ্গদর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের মোট পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে এই রচনাটির মূল্য অপরিসীম। রচনাটি ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত না হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রের একটি মূল্যবান সৃষ্টির সঙ্গে আমরা পরিচয়ের সুযোগ পাইনি। সঞ্জীবচন্দ্র যে কেবল 'পালামৌ' বা কয়েকটি উপন্যাসের রচয়িতা-মাত্র নন, তিনি যে বাংলায় বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালীকে যথেষ্ট সম্পদ দান করে গেছেন—এ তথ্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রও বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বের একটি মাত্র বিষয় অবলম্বনে বাঙালী পাঠকের উদ্দেশ্যে যে সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তা উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি দুর্লভ উদাহরণ হিসাবে পরিগৃহীত হবে। লেখক তাঁর সমস্ত আলোচনাটিকে আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। সন্তান তার জনক জননীর দেহাকৃতির কতখানি অধিকারী হয়, শুধু পিতা মাতা কেন—সেই সন্তান তার পিতামহ প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ

প্রপিতামহ বা তদূর্ধ কোন পুরুষের ন্যায় হতে পারে কি না, অথবা কিভাবে হয়, একেবারে ভিন্ন বংশোদ্ভব কোন লোকের ন্যায় হওয়া সম্ভব কি না, জাতিবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বৈজিক প্রবলতা কিরূপ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। আলোচনার পাদটীকায় লেখক Darwinএর Variation of Animals এবং Herbert Spencerএর Principles of Biology গ্রন্থ দুটি থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। লেখক যে বিষয়টি দীর্ঘকাল গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তা রচনাটি পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র বিষয়টিকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে দেখেন নি, সেই তত্ত্বটি আমাদের সমাজে কিভাবে গৃহীত ও প্রযুক্ত হতে পারে সে সম্পর্কেও অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'বৈজিকতত্ত্ব' নিবন্ধের প্রথম কয়েকটি ছত্র :

"জনকের ন্যায় পুত্র, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালার সর্বত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানেরা কিয়দংশে পিতার ন্যায় কিয়দংশে মাতার ন্যায় হইয়া থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা এই সর্বসাধারণ পরিচিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের অভিপ্রায়। বৈজিকতত্ত্ব প্রথমতঃ যত সামান্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। ইদানীং বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতেরা ইহার নিয়মানুসন্ধানে বহু যত্ন করিতেছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"—বঙ্গদর্শন ১২৮৪ অগ্রহায়ণ।

সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত 'পালামৌ' এবং দুটি উপন্যাস 'মাধবীলতা' ও 'জালপ্রতাপচাঁদ' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'সঞ্জীবনীসুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই।···কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন।" কালের বিচারে তিনি যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করলেই সে কথা স্বীকার করতে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের নূতন রচনা। মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী হলেও, এর মধ্যে উপন্যাস ও

প্রবন্ধেরও কিছু কিছু উপাদান বর্তমান। প্রকৃতিবর্ণনায়, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং চিত্রসমালোচনায় লেখক এই রচনাটিতে অসাধারণ কৃতিত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'মাধবীলতা' সঞ্জীবচন্দ্রের একটি বড় উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।" সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাগুলি পাঠ করলেই রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার পক্ষে একজন ঔপন্যাসিকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভায় তা পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, সমন্বয়-কৌশলের অভাবে তিনি খাঁটি উপন্যাস রচনার সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 'মাধবীলতা' উপন্যাসে লেখক এক অতীত কালের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন, যে কাল আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ও রহস্যাবৃত। অলৌকিক দৈবশক্তির বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র উপন্যাসটিকে অতিপ্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে। উপন্যাসের মূল পরিবেশটি কোনসময়েই ঠিক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি।

বঙ্গদর্শনের নবম বর্ষে 'জালপ্রতাপচাঁদ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। একদা বর্ধমানের রাজবাড়ির জালপ্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করে যে বিরাট মামলা-মোকদ্দমা চলেছিল, সঞ্জীবচন্দ্র সেই ঘটনা অবলম্বনে, আদালতের পুরাতন পুঁথি ও নথিপত্রের সাহায্যে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে 'জালপ্রতাপচাঁদ' উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। এই উপন্যাসেও লেখক 'গৃহিণীপনা'র অভাবে তাঁর প্রতিভাকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে পারেন নি। ঘটনাসংস্থান, তথ্য সংগ্রহ ও লিপিকুশলতায় সঞ্জীবচন্দ্র যে অসামান্য দক্ষতা এবং নানা জটিলতা ভেদ করে কৌতূহলজনক কাহিনী উপস্থাপনে যে পর্যাপ্ত ক্ষমতার পরিচয় দেন তা বিস্ময়কর হলেও একথা স্বীকার করতে হবে, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর এই অসামান্য ক্ষমতাকে উপন্যাস রচনায় সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। লেখক আরও একটু সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সাময়িকতার আকর্ষণ অতিক্রম করে যদি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক আরও একটি স্থায়ী সম্পদ লাভের অধিকারী হবার সুযোগ পেতেন।

বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলা সঞ্জীবচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

পূ র্ণ চ ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়। বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' ও 'শৈশব সহচরী' বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত হয়। 'মধুমতী' গল্পের পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। করালী-চরণ, মধুমতী ও লালগোপাল—কাহিনীর তিন মুখ্য চরিত্র।

'শৈশব সহচরী' বহুঘটনাসমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। উপন্যাসটিকে রসঘন ও রহস্যমণ্ডিত করার জন্য লেখক অনেক চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করেছেন, কিন্তু প্রায়শই ঘটনাগুলি বাস্তবতার সীমাকে অতিক্রম করেছে। পূর্ণচন্দ্রের বর্তমান রচনাটিতেও নানা স্থানে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষণীয়। কাহিনীর মুখ্য চরিত্র রজনীকান্ত ও কুমুদিনী। উপন্যাসের শেষাংশে রজনীকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়েছে শরৎকুমার। কাহিনীটি পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠলেও ঘরোয়া ছবির সমাবেশ তেমন দানা বাঁধে নি। জাহ্নবীর তীর, অন্ধকার মন্দির, জনশূন্য পথ, জীর্ণ কুটির উপন্যাসের ঘটনার কেন্দ্র হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই। শরৎকুমারের ব্যর্থ প্রণয় এবং কুমুদিনী রজনীকান্তের মিলনচিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

দী ন ব ন্ধু মি ত্র। প্রথমেই একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করি :

রাত পোহালো, ফর্‌সা হলো,
ফুট্‌লো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা,
জুট্‌লো অলিকুল॥

এই বিখ্যাত কবিতাটি বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। অতঃপর বঙ্গদর্শনে তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ', প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় অর্থাৎ কার্তিকে প্রকাশিত হয়। এটিকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' গল্পটিকে অনেকে প্রথম ছোটগল্প হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পটি তারও সাত মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। কুড়রাম দত্তের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী নিয়ে রচিত 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ'। যমপুরীতে কুড়রামের আবির্ভাব, যমরাজের সিংহাসনচ্যুতি, লক্ষ্মীর নিকট যমরাজের আগমন, কুড়রাম কর্তৃক অজস্র পাপীকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার, শিব-কর্তৃক কুড়রামের পুনরায় মর্ত্যে

প্রত্যাবর্তন ও তার নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে এই গল্পে। অদ্ভুত অসঙ্গতি ও হাস্যরস সৃষ্টিই দীনবন্ধুর এই গল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্র ফু ল্ল চ ন্দ্র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ ফাল্গুন চৈত্র, তৃতীয় বর্ষের আষাঢ় আশ্বিন অগ্রহায়ণ এবং চতুর্থ বর্ষের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ – তিন বৎসরের উল্লিখিত সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের এই দীর্ঘ নিবন্ধটি মুদ্রিত হয়। রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁরা সকলেই প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের গোড়ার দিকে পুরাতত্ত্ব গবেষণায় উদ্যোগী হন। লেখক তাঁর আলোচনাটিকে কয়েকটি 'প্রস্তাবে' বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল: ভূবৃত্তান্ত, জ্ঞানোন্নতি, রাজধর্ম, রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণবর্গ, বৈশ্যবর্গ—কৃষি এবং বাণিজ্য, সামরিক ব্যাপার। এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য কি তা লেখক প্রথম প্রস্তাবের ভূমিকাতেই ব্যক্ত করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য, "রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে সময়েই জন্মিয়া থাকুন, ইহা বোধ হয় নিশ্চিত যে, সেই সময়ের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ হইয়া আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই। এস্থলে তাঁহার প্রণীত রামায়ণ অনেক অভাব বিমোচনে সমর্থ।" এই বিবেচনাতেই লেখক বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক সেযুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বহু অধ্যয়ন ও যথার্থ আধুনিক গবেষক-মনের পরিচয় রয়েছে এই প্রবন্ধের মধ্যে। লেখক তাঁর সকল বক্তব্যই প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। রামায়ণের কোন্ পাঠ আদর্শ বা আদর্শ নয় সে বিষয়েও প্রফুল্লচন্দ্র সর্বদা সতর্ক ছিলেন। বিষয়-বিন্যাস ও প্রবন্ধ-পরিকল্পনায় লেখকের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি যথার্থ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধরচনার উপযুক্ত। 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

লা ল মো হ ন বি দ্যা নি ধি। বঙ্গদর্শনে 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' প্রকাশকালেই লালমোহন শর্মা (বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য) প্রণীত 'ভারতবর্ষীয়

আর্যজাতির আদিম অবস্থা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ফাল্গুন এবং তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ থেকে ভাদ্র, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাঘ ও চৈত্র—এই সংখ্যাগুলিতে লালমোহনের রচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের পরিকল্পনা অনেকটা পূর্ববর্তী প্রবন্ধটির ন্যায়। তবে প্রফুল্লচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন আর লালমোহন প্রাচীন পুরাণ উপপুরাণ শাস্ত্র সাহিত্য—বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যজাতির অবস্থার চিত্র—তাদের বাসভূমি, শাসনপ্রণালী, কোষাগার, বিচার, ব্যবসা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন।

'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' এবং 'ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' এই প্রবন্ধ-দুটি প্রকাশের পূর্বেই বঙ্কিমের 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' শীর্ষক নিবন্ধ বঙ্গদর্শনে (১২৮০ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা আবশ্যক। বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথেই প্রফুল্লচন্দ্র ও লালমোহন অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

লালমোহন প্রণীত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থটি বঙ্কিম কর্তৃক বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হয়। 'ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' যখন বঙ্গদর্শনে সম্পূর্ণ হয়, সেই সময় লালমোহনের নূতন গ্রন্থ 'সম্বন্ধ নির্ণয়' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিম তাঁর 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার—দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রবন্ধে (১২৮২ অগ্রহায়ণ) লালমোহনের গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক—কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থ প্রসঙ্গে লালমোহনের উদ্দেশ্যে যে কথা বলেছেন, তা 'ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গেও সমানভাবে বর্তে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। "উভয় ভ্রাতায় বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লিপিচাতুর্যের বড় প্রশংসা করিতেন। বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার বলিয়াছিলেন চন্দ্রশেখরবাবুর দু'একটি প্রবন্ধ পড়িয়া নিজের লেখা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর লেখা 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে' এই কথা বলেছেন।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সেযুগে প্রথমে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র প্রণেতারূপেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন, পরে বঙ্গদর্শন 'বান্ধব' 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকরূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমের আহ্বানেই চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। 'শ্মশানে ভ্রমণ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রশেখরের প্রথম রচনা। অতঃপর তাঁর যে ক'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলি হল 'বঙ্গে ধর্মভাব', 'মানব ও যৌন নির্বাচন', 'সতীদাহ', 'বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম' ও 'ভার্গববিজয়'।

চন্দ্রশেখরের রচনাগুলি পাঠ করলে একই সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সুরসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। শুধু ইংরেজি সংস্কৃত নয়, ফরাসী ভাষাও তিনি অনুশীলন করেছিলেন। যৌন নির্বাচন থেকে সতীদাহ—বিবিধ বিষয়েই তাঁর কিছু না কিছু বক্তব্য ছিল। লেখক পাশ্চাত্য মনীষীবর্গের নানাবিধ দার্শনিক মতবাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত ছিলেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সারস্বতকুঞ্জ' গ্রন্থে চন্দ্রশেখরের দশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। তার মধ্যে পাঁচটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। 'শ্মশানে ভ্রমণ' প্রবন্ধটি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থের একটি অংশ। এই প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক মাস পরেই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদর্শনে তাঁর 'বাঙ্গালার সাহিত্য' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর সম্পর্কে লিখেছেন, "চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা, তাঁহার লিখিত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখরের মৃত্যুতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যে' (১৩২৯ কার্তিক) যে প্রশস্তি লেখেন তাতে বঙ্কিমের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বঙ্কিমের সেই মন্তব্যটি এখানে উদ্ধার করা গেল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন চন্দ্রশেখরের লেখায় কলম ডালিবার যো নাই। সে এমন সাজাইয়া গোছাইয়া লিখে, এমন ওজন করিয়া শব্দ চয়ন করে যে একটি শব্দও বদলাইবার অবসর থাকে না। চন্দ্রশেখরের গদ্য সত্যই অতুল্য ও অনুপম ছিল।"

ন গে ন্দ্র না থ চ ট্টো পা ধ্যা য়। এঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত হয়। সেগুলি হল: 'ভারতে একতা', 'বোম্বাই ও বাঙ্গালা', 'পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায়', 'সতীদাহ' (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সতীদাহ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ), 'কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ', 'সমাজসংস্কার'।

'ভারতে একতা' জাতীয়সংহতি-সম্পর্কিত একখানি মূল্যবান প্রবন্ধ। ধর্ম, ভাষা, বংশ, প্রাকৃতিক সীমা, সামাজিক প্রথা—নানাদিক থেকে বিচার করে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে একতার কোন সাধারণ লক্ষণ নেই। সমগ্র ভারতে কি কখনও এক ভাষা প্রচলিত হওয়া সম্ভব? লেখকের মতে, "নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ক্রমে ইংরেজি ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে। যাঁহারা সে প্রকার বিশ্বাস করেন করুন, আমরা কিন্তু সে কথায় হাস্য না করিয়া থাকিতে পারি না।...প্রচলিত দেশীয় ভাষা-সকলের মধ্যে যদি কোন ভাষার পক্ষে ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা হিন্দি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কেন না ভারতে হিন্দি ভাষাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত।" লেখক যাকে 'সাধারণ ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন, একালে তারই নাম রাষ্ট্রভাষা, এবং এই হিন্দিই এখন আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

'বোম্বাই ও বাঙ্গালা' প্রবন্ধটি বোম্বাই প্রদেশের বর্ণনা এবং কোন কোন স্থলে কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের তুলনামূলক আলোচনা।

'পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায়' পঞ্চম বর্ষের দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

লেখক এই প্রবন্ধে আধুনিককালের পাঞ্জাবীদের চরিত্র বীর্য এবং তাদের সামাজিক রীতি নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেন।

'কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ' প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ আমাদের দেশের প্রচলিত অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপের কারণবাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং 'সমাজ সংস্কার' প্রবন্ধে সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, সামাজিক মানুষের কর্তব্য, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও তার পথ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি আমাদের দেশের পটভূমিতে গভীরভাবে আলোচনা করেন।

একজন যথার্থ প্রবন্ধশিল্পীর লেখনী নিয়ে নগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। বক্তব্যবিষয়কে কতখানি সহজ ও আকর্ষণযোগ্য করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা যায়—বর্তমান রচনাগুলিতে লেখক তা প্রমাণ করেছেন। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ এবং যুক্তিধর্মী-প্রবন্ধরচনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য।

র জ নী কা ন্ত গু প্ত। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে রচনা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর রচিত গ্রন্থ 'জয়দেব চরিত' বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হয়েছিল।

রজনীকান্ত বহু গ্রন্থের রচয়িতা। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বঙ্গদর্শনে রজনীকান্ত মূলতঃ ভারত-ইতিহাস-কাহিনীই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। লেখকের এই আক্ষেপ ছিল যে, "ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যন্ত লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।" একথা লেখক 'ভারতকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রজনীকান্তের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিবন্ধ হল 'অশোক', 'বাঙ্গালীর বীরত্ব' ও 'জগৎশেঠ'। এই সামান্য ক'টি রচনার মধ্য থেকেই রজনীকান্তের ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা যায়। রজনীকান্ত সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি, "বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।" লেখকের মন্তব্য যথার্থ এবং এই উক্তির সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, রজনীকান্ত কখনও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অন্ধ অনুরাগ প্রকাশ

করেননি এবং তাঁর রচনার মধ্যেও কোথাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য প্রকটিত হয়নি। লেখকের ভাষা সংযত ও ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনার উপযুক্ত।

পূর্ণচন্দ্র বসু। বঙ্গদর্শনে পূর্ণচন্দ্র বসুর কয়েকটি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। সেযুগে যে-সকল লেখক বঙ্কিমসাহিত্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন পূর্ণচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমসাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃণ্ময়ী' (জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮১ বঙ্গাব্দ)। যদিও 'মৃণ্ময়ী' দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাস, তথাপি এই উপন্যাস কপালকুণ্ডলার উপসংহারভাগ অবলম্বনে রচিত বলে প্রাসঙ্গিকভাবে মূল গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে 'মৃণ্ময়ী'র তুলনামূলক বিচার হয়েছে। অতঃপর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা (আর্যদর্শন ১২৮৪)। বঙ্গদর্শনে পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কুন্দনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১২৮৫র জ্যৈষ্ঠে। এ-সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র। প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করে জানা যাচ্ছে, পূর্ণচন্দ্র বসুর প্রবন্ধেই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-সমালোচনার সূত্রপাত। অতঃপর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পত্রিকায় বঙ্কিমসাহিত্যের কিছু তুলনামূলক আলোচনা করেন।

পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কুন্দনন্দিনী' প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে অসমাপ্ত অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে যায়। যদিও প্রথম কিস্তির শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দটি ছিল এবং লেখকও ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা পরবারে কুন্দনন্দিনীর বাহ্যব্যবধান বিমুক্ত করিয়া তদীয় হৃদয়সৌন্দর্য দেখিবার জন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত তাহাকে অনুসরণ করিব"—তথাপি বঙ্গদর্শনে 'কুন্দনন্দিনী'র আর দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয় নি। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন, 'তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নহেন, অধিকারীও নহেন'—এতৎ সত্ত্বেও মনে হয়, বঙ্কিমের নির্দেশেই এই প্রবন্ধের প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছিল।

পূর্ণচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে কুন্দনন্দিনীর জীবনকে বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এই দুই দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। প্রথম অংশে লেখক কুন্দনন্দিনীর বাহ্যপ্রকৃতির বিশেষত্বটুকুই ব্যাখ্যা করেছেন, উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় অংশে কুন্দর 'হৃদয় আবরণ' উন্মোচিত করবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই দ্বিতীয় অংশ আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নি। লেখক প্রবন্ধের প্রথম অংশে

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সূর্যমুখীর তুলনা করে উভয়ের মধ্যে কোথায় কি প্রভেদ তা দেখাতে চেয়েছেন।

'জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি' ও 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' পূর্ণচন্দ্র-রচিত দুটি সমালোচনা-নিবন্ধ। প্রথমটি যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তে'র সমালোচনা, দ্বিতীয়টি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থের সমালোচনা। 'কুন্দনন্দিনী' অপেক্ষা এই দুই প্রবন্ধে লেখকের ভাষা অনেক সংযত ও উচ্ছ্বাসবর্জিত।

চ ন্দ্র না থ ব সু। বঙ্গদর্শনে চন্দ্রনাথ বসুর প্রথম রচনা 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ১২৮৭ ও ১২৮৮ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এটিই চন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা রচনা যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পূর্বে চন্দ্রনাথ যা-কিছু লিখেছেন তা মূলতঃ ইংরেজি ভাষাতে। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে চন্দ্রনাথ বসু এক স্থানে লিখেছেন, "বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজি পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীবাবুর হাতে। বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম।" দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টির আলোকে চন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা করেন। লেখকের মতে শকুন্তলা গ্রন্থটি কাব্যের আকারে রচিত ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের প্রতিরূপ। লেখক নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মধ্যে সাংখ্য দর্শনের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যান আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বাংলা কথাগ্রন্থ বা উপন্যাসের উদ্ভব এবং উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তারিত তত্ত্বমূলক আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের উপন্যাস নানাপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের উদ্দেশ্য কি কেবল মনোরঞ্জন করা? লেখকের বক্তব্য, "নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।" সত্যবর্ণনা বা স্বভাব-বর্ণনাই কি ঔপন্যাসিকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? লেখক সকল প্রশ্নই আলোচনা করেছেন আদর্শ মূল্যবোধের বিচারে। উপসংহারে লেখকের উক্তি, "যাঁহারা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাবসমস্তের অবিকল

'তরজমা' করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই দেশের ধন্যবাদার্হ বলিয়া মনে করিতে পারিব না।" 'ফুলের ভাষা' ও 'অদৃষ্ট' ব্যক্তিগত রচনা, কমলাকান্তের দপ্তরের রচনারীতির প্রভাব বর্তমান। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল: 'ইহলোক ও পরলোক', 'জীবন ও পরলোক', 'পরলোক কোথায়' ও 'হিন্দুপত্নী'।

শ্রী শ চ ন্দ্র ম জু ম দা র। বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ বর্ষে পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিমসাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। সপ্তম বর্ষে প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা' এই শ্রেণীর অপর একটি আলোচনা। বর্তমান প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও শেক্সপীয়রের নাটকের কোন তুলনামূলক আলোচনা নয়। লেখক সাধারণভাবে মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই দুই সমাজবিরহিত চরিত্র ভিন্নদেশীয় দুই কবির লেখনীতে কিরূপে চিত্রিত হয়েছে তা দেখাতে চেয়েছেন। লেখকের মতে, "যে নিয়মে জড়জগৎ শাসিত হইতেছে, অন্তর্জগতের নিয়মও তাহাই।—ভেদ কেবল প্রকারে, বিষয়ে নহে। যে নিয়মে সামাজিক জীবের গঠন, কবির চিত্রও সেই নিয়মের ফল। মানবচরিত্র দেশ ও কালের ফল, কবির চিত্রিত মানবচরিত্রও তাই। মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা চরিত্রও ঐ নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল।"

মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় মাইকেল স্মরণে দুটি কবিতা ও কয়েক ছত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বঙ্গদর্শনে মাইকেল সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা মুদ্রিত হয়নি। ভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও মাইকেলের নাম উদ্ধৃত হয়েছে মাত্র। বঙ্গদর্শনের অষ্টম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক নিবন্ধের গোড়াতেই লিখেছেন, "মেঘনাদই বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত তারা। যিনি বাঙ্গালিকে মেঘনাদবধ কাব্য বুঝাইতে সক্ষম, তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না।" যাই হোক, শ্রীশচন্দ্রের বর্তমান নিবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সামগ্রিক বিশ্লেষণ নয়। লেখক নিজেও বলেছেন, "মেঘনাদবধের রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।" লেখকের প্রবন্ধরচনার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি এইখানেই। যথার্থ সামগ্রিক দৃষ্টি

এবং গভীরতা—কোনটাই শ্রীশচন্দ্রের রচনায় লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরীতির সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের রচনারীতির মিল অধিক। বিশ্লেষণ অপেক্ষা রসাস্বাদনের প্রতি লেখকের আগ্রহ ও প্রবণতা বেশি। 'মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নিবন্ধে লেখক মুখ্যতঃ প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের মহিমা ও গৌরব বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে দু-একটি অপ্রধান চরিত্রও আলোচিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি নিবন্ধের মধ্যে 'প্রকৃতি' শ্রীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। মিলের 'Liberty' অবলম্বনে লেখক এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রকৃতির যথার্থ সংজ্ঞা কি, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপ কি, মানুষের আদর্শ ও প্রকৃতি, নীতি ও প্রকৃতি এবং সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান কি ইত্যাদি বিষয়ে লেখক সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন।

অন্যান্য লেখক। বঙ্গদর্শনে আরও যে-সকল লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন: জগদীশনাথ রায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ দাস, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

জগদীশনাথ রায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রাতৃবৎ বন্ধু'। ১২৮২র চৈত্র সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' রচনাটির একস্থানে বঙ্কিম লিখেছেন, "বাহুল্যভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ'র একস্থানে লিখেছেন, "বঙ্কিমবাবু আমায় একবার বলিয়াছিলেন, জগদীশবাবু তাঁর চেয়ে অন্তত পনের বছরের বড়। অথচ সমবয়স্কের মত তাঁহাদের বন্ধুতা ছিল।"

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'সঙ্গীত' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনায় লেখকের নাম ছিল না। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সঙ্গীত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের গোড়াতেই তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখেছেন, "১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীত-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত। যতটুকু আমার রচনা তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না।" বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় 'সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশটি প্রকাশিত হয়, তা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করেন নি। লক্ষণীয় যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়, তার সামান্য অংশ মাত্র বঙ্কিম তাঁর গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করলে মনে হয়—মূল রচনাটি জগদীশনাথ রায়ের লিখিত; পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে সম্পাদক রচনাটি সংশোধন ও কোন কোন অংশ সংযোজন করেন। সম্পাদক কর্তৃক যতটুকু অংশ লিখিত বঙ্কিম কেবল সেই অংশটুকুই পুনর্মুদ্রিত করেছেন, অবশিষ্ট অংশ নয়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বঙ্কিম কর্তৃক গ্রন্থভুক্ত অংশ অপেক্ষা অবশিষ্ট অংশের পরিমাণই অধিক।

জগদীশনাথ রায়ের এই প্রবন্ধ যখন মুদ্রিত হয় তখন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের ধারাবাহিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হচ্ছিল। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বঙ্কিম উৎসর্গপত্রে লেখেন, "কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।"

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কি জগদীশনাথ রায়ের কলমের স্পর্শ আছে? শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমজীবনী'তে লিখেছেন, "হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় কর্তৃক লিখিত।"

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সঙ্গীত সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। এই লেখকের 'সেতার শিক্ষা' নামক একটি গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে ১২৮০র আষাঢ় সংখ্যায় সমালোচিত এবং বঙ্গদর্শন-সমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত হয়। 'সঙ্গীত সমালোচনা' প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ এবং নিতান্তই স্বরগ্রাম সুর ও শ্রুতিবিষয়ক।

শ্রীকৃষ্ণ দাস রচিত 'চৈতন্য' মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যবিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা-নিবন্ধ। বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষের আশ্বিন অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন—এই কয়টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূল প্রবন্ধটি লেখক সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল: চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা, বাল্যকাল, বিদ্যাবিলাস, ধর্মভাবের অঙ্কুর, বঙ্গদেশ দর্শন, দ্বিতীয় বিবাহ, গৃহে নামসংকীর্তন। লেখক বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী পাঠ করে নানা তথ্য সহযোগে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিক পত্রিকা বঙ্গদর্শনে ১২৭৯র পৌষ সংখ্যায় সমালোচিত ও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বঙ্গদর্শনের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা 'জ্ঞানাঙ্কুরে'ই প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ দাসের মাধ্যমে বঙ্কিম চন্দ্রশেখরকে আবিষ্কার করেছিলেন।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা' বঙ্গদর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বহু চিত্র-চরিত্র-ঘটনার সমাবেশে লেখক চমৎকার কাহিনী-বিন্যাস করেছেন। সমগ্র রচনার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন রসিকতার ভাব বর্তমান। অথচ তার মধ্যে গভীর কথা বলতেও লেখক দ্বিধা করেন নি।

বঙ্গদর্শনে ১২৮৪র মাঘ ও ১২৮৫র আশ্বিন—এই দুই সংখ্যায় কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'মণিপুরের বিবরণ' শীর্ষক রচনা প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ মণিপুরের ইতিহাস ও মণিপুরীয় জাতির বিবরণ। নানা তথ্য, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে লেখক এই নিবন্ধ রচনা করেন।

দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎকলের প্রকৃতাবস্থা' প্রকাশিত হয় ১২৮৫র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ—এই তিন সংখ্যায়। লেখক এই প্রবন্ধে উৎকলের পুরাকালিক ইতিহাস, জাতিনির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। লেখকের ভাষা সহজ এবং সরস। দীননাথ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন, "উৎকলবাসীদিগের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহা কোন ইতিহাসের অনুবাদ নহে। উড়িষ্যার ইতিহাস লেখকগণ অনবধানতাবশতঃ উড়িষ্যার বিষয় যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা লিখিত হইল।"

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গোন্নয়ন' বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় মোট পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। লেখক প্রবন্ধের গোড়াতেই জানিয়েছেন, "বাঙ্গালি মাত্রেই বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ বঙ্গোন্নতির প্রতিকূল আছে। সেই সকল কারণের সমালোচনা প্রায় কেহই করেন না। ঈদৃশ সমালোচনা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।" একদিকে বাঙলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু, অপরদিকে বাঙলার নানা মারাত্মক রোগ ও ব্যাধির বিবরণ দিয়ে লেখক বোঝোতে চেয়েছেন যে এই সকল কারণেই বাঙলা দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর হচ্ছে না।

বঙ্গদর্শনের নবম বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় তারাপ্রসাদের 'বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ' শীর্ষক যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, তাকে পূর্ববর্তী 'বঙ্গোন্নয়ন' প্রবন্ধের অনুবৃত্তি রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। লেখকের মতে, "বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্বল্যই তাহাদের পৌরুষাভাবের প্রধান কারণ।" বাহুবল ও শারীরিক বলের চর্চার মধ্য দিয়েই বাঙালী পৌরুষ ও সেই সঙ্গে গৌরব লাভ করতে সক্ষম হবে।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের 'বাঙ্গালির বাহুবল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১২৮১র শ্রাবণ সংখ্যায়। তারাপ্রসাদের বর্তমান রচনা বঙ্কিমের উপরিউক্ত প্রবন্ধপাঠের ফল বলে মনে হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের 'উপাসনাবিষয়ক তুলনা' প্রকাশিত হয় ১২৮৭র শ্রাবণ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে লেখক দুটি মত সন্নিবেশিত করে "প্রাচীন হিন্দু তথা তান্ত্রিক মতের সহিত অভিনব পাশ্চাত্য মতের বৈষম্য কিছুমাত্র অপনীত হইতে পারে কি না"—এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় বঙ্কিম ব্যতীত যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন গুহ।

বঙ্গদর্শনের কালানুক্রমিক সূচী

বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য বঙ্গদর্শন পত্রিকার একটি পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রমিক সূচী এখানে সংকলিত হল। বঙ্কিম-গবেষণা প্রসঙ্গে এই সূচী-প্রণয়নের আবশ্যকতা দীর্ঘকাল অনুভূত হয়ে এসেছে। শুধু বঙ্কিম প্রসঙ্গে নয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই পত্রিকাটির তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণ এক দশক কাল বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়ে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেছে তা নয়; সেই সঙ্গে পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্য নিয়ন্ত্রণ এবং তার গতি ও পথ নির্ধারিত করেছে।

সাধারণভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখক-লেখিকার নাম প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না। সমগ্র বঙ্গদর্শনের যে ক'টি রচনায় লেখক-নাম মুদ্রিত হয়েছে তা প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যায়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রায় সকল রচনাই তাঁর স্বাক্ষর ব্যতিরেকেই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। রচয়িতার নাম যে শুধু সূচীপত্রে বা পত্রিকার অভ্যন্তরে মুদ্রিত হয়নি তা নয়; বৎসর শেষে যে বর্ণানুক্রমিক বার্ষিক রচনাসূচী সংকলিত হয়েছিল সেখানেও কোন লেখক নামের নির্দেশ নেই। এই সকল কারণে শতবর্ষ পূর্বের পুরাতন বঙ্গদর্শন পত্রিকার একটি পূর্ণাঙ্গ লেখক-তালিকা অদ্যাবধি আমরা সংকলন করতে পারি নি। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও, একথা স্মরণযোগ্য যে বঙ্কিম ব্যতীত সেযুগের আরও বহু লেখক বঙ্গদর্শনের সমৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করেছিলেন। আমরা বর্তমান সূচীতে বিবিধ প্রামাণিক তথ্য ও সূত্রের ভিত্তিতে সমগ্র নয় বৎসরের বঙ্গদর্শনের প্রায় সকল লেখকের নাম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এখানে যে কালানুক্রমিক সূচী সংকলিত হল তার মধ্য থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা যায়:

ক. পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কি কি রচনা প্রকাশিত হয়।

খ. একই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে কতগুলি রচনা লেখেন।

গ. বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত বঙ্গদর্শনের অন্যান্য কোন্ কোন্ লেখকের কি কি রচনা বেরিয়েছে।

ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য লেখক রচিত ধারাবাহিক রচনাগুলির প্রকাশ-কালসীমা।

ঙ. পত্রিকায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সেকালের কি কি গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা হয়।

চ কোন্ কোন্ সংখ্যায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগটি প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া পাঠক প্রস্তুত সূচী থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করতে পারবেন—সমগ্র নয় বৎসরের বঙ্গদর্শনে ক'টি কবিতা, কি কি উপন্যাস এবং কতগুলি প্রবন্ধ বা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এবং এই সূচী-সন্দর্শনেই নানা বিচিত্র তথ্যাদির মধ্যে জানা যাবে বঙ্কিম তাঁর স্বীয় পুস্তকে যে রচনাগুলি সংকলন করেন, পত্রিকায় তার অনেকগুলিই ভিন্ন শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এখনও কিছু কিছু রচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য রয়েছে যা পুস্তকাকারে অমুদ্রিত; এবং সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রেরও একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক রচনা 'বৈজিকতত্ত্ব' অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। 'বৈজিকতত্ত্ব' রচনাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তা বর্তমান সূচীতেই সর্বপ্রথম নির্দেশিত হল। 'পালামৌ' রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্রের এই রচনাটির কথা 'সাহিত্য-সাধক-চরিতামালা' বা অন্যত্রও নেই।

প্রস্তুত তালিকায় রচনার পূর্বানুবৃত্তি বোঝানোর জন্য [*] তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হল।

প্র থ ম ব র্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৭৯ বৈশাখ

পত্র সূচনা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারত কলঙ্ক (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কামিনী কুসুম (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষবৃক্ষ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, আমরা বড়লোক (প্রবন্ধ), সঙ্গীত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, উদ্দীপনা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ

উদ্দীপনা*, বিষবৃক্ষ*, বিজ্ঞান কৌতুক ১। সর্ উইলিয়ম টমসনকৃত

জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক ;—কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

উত্তরচরিত।*

প্রথম সংখ্যা।

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যে রূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত বোধ হয় না।" আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না, যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু, মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন?

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা, ঝিল বিল হ্রদের যে রূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস্, কাল্দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী বটে।

সেক্ষপীয়র পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও, ইউরোপে তাঁহার সমুচিত মর্য্যাদা অল্পকাল হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত, কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য্য নাটক সকলের মর্ম্ম বুঝিতেন না। ড্রাইডেন্, পোপ, জন্সন্, প্রভৃতি সকলে স্বয়ং কবি, এবং সকলেই সযত্নে সেক্ষপীয়রের গ্রন্থের সমা-

* উত্তর চরিত। বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রী নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রাকৃতযন্ত্র।

[বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের এই অংশ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত।]

জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা[১] ২। আশ্চর্য সৌরোৎপাত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরচরিত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, সঙ্গীত*।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৭৯ আষাঢ়

বিষবৃক্ষ*, উত্তরচরিত*, জ্ঞান ও নীতি (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ / অনুষ্ঠান পত্র[২], প্রভাত (কবিতা)—দীনবন্ধু মিত্র, গ্রাবু (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রসিকতা (প্রবন্ধ)।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৭৯ শ্রাবণ

কোমৎদর্শন (প্রবন্ধ), সঙ্গীত[৩]—জগদীশনাথ রায়, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল*, উত্তরচরিত*, বিষবৃক্ষ*, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, ঊষা (কবিতা), স্বস্বভাবানুবর্তিতা (প্রবন্ধ)।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৭৯ ভাদ্র

উত্তরচরিত*, স্বস্বভাবানুবর্তিতা*, বিষবৃক্ষ*, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত*, দেবনিদ্রা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক / দেশের শ্রীবৃদ্ধি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৭৯ আশ্বিন

বিষবৃক্ষ*, উত্তরচরিত*, একান্নবর্তী পরিবার (প্রবন্ধ), আচার্য গোল্ডষ্টুকর কৃত পাণিনি বিচার (প্রবন্ধ), বাঙ্গালা ভাষা (রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত

১. বিজ্ঞানরহস্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত।

২. বঙ্গদর্শনে এই রচনাটির শেষে নিম্নরূপ লেখা, "যে অনুষ্ঠান পত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্‌ সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম।…বঙ্গদর্শন সম্পাদক।"

৩. বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনায় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীত-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম।" বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যায়টিই বঙ্কিম তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। সুতরাং প্রবন্ধের এই অংশটিই জগদীশনাথ রায়ের রচনা।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব প্রথম ভাগ গ্রন্থের সমালোচনা), জ্ঞান ও নীতি*।

সপ্তম সংখ্যা ১২৭৯ কার্তিক

বিষবৃক্ষ*, স্বাভাবিক ও অভ্যস্থ পুণ্যকর্ম (প্রবন্ধ), যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ (উপন্যাস)—দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্গদেশের কৃষক* / জমিদার, বায়ু (কবিতা) —বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালা ভাষা*, নূতন গ্রন্থের সমালোচন[১]।

অষ্টম সংখ্যা ১২৭৯ অগ্রহায়ণ

আকাশে কত তারা আছে (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালা ভাষা*, বিষবৃক্ষ*, কালিদাস (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, ইংরাজ স্তোত্র / মহাভারত হইতে অনুবাদিত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, সাবিত্রী (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মনীতি (প্রবন্ধ), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নবম সংখ্যা ১২৭৯ পৌষ

বিষবৃক্ষ*, বঙ্গদেশের কৃষক* / আইন, যাত্রা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, সাংখ্যদর্শন (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, রামায়ণের সমালোচনা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দশম সংখ্যা ১২৭৯ মাঘ

বিষবৃক্ষ*, সাংখ্যদর্শন*, কালিদাস (আলোচনা)—প্রাণনাথ পণ্ডিত, পরশমণি (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বররুচি (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, ঐক্য (প্রবন্ধ), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

একাদশ সংখ্যা ১২৭৯ ফাল্গুন

বিষবৃক্ষ*, বঙ্গদেশের কৃষক* / প্রাকৃতিক নিয়ম, ধূলা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিম-চন্দ্র, Three Years in Europe (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সাংখ্য-দর্শন*, বাবু (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, একদিন (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীহর্ষ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, বানরচরিত (প্রবন্ধ), বিরহিণীর দশ দশা (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত বঙ্কিমরচনাবলী 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৭৯ চৈত্র

ভাষার উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভগ্নাংশ (প্রবন্ধ), ইন্দিরা (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা (প্রবন্ধ), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন[১]—বঙ্কিমচন্দ্র।

দ্বি তী য় ব র্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮০ বৈশাখ

অবকাশরঞ্জিনী[২] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন*, নয়শোরূপেয়া (সমালোচনা), বসন্ত এবং বিরহ (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, যুগলাঙ্গুরীয় (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, তুলনায় সমালোচনা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, জাতভিক্ষুক—(প্রবন্ধ), আদর (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ

দুর্গা[৩] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, সাম্য (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুমতী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্নদার শিবপূজা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কিনা (প্রবন্ধ), দানবদলন কাব্য[৪] (সমালোচনা) —বঙ্কিমচন্দ্র, ঘোর অদৃষ্টবাদিত্ব (প্রবন্ধ), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮০ আষাঢ়

বহুবিবাহ (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন*, সাম্য*, দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতিভা (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ

১. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

২. গীতিকাব্য—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

৩. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

৪. প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

মুখোপাধ্যায়, জুমিয়া জীবন (প্রথমে গদ্য ভূমিকা পরে কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮০ শ্রাবণ

জন ষ্টুয়ার্ট মিল[১] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, জাতিভেদ (প্রবন্ধ) শ্রীযঃ, চন্দ্রশেখর (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, স্বপ্ন প্রয়াণ (কাব্য)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গর্দভ (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮০ ভাদ্র

চঞ্চল জগৎ (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর*, কমলাকান্তের দপ্তর (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত[২] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, অতলস্পর্শ (প্রবন্ধ), অশোকবনে সীতা (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ / স্বাধীনতা[৩] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, মেঘ (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮০ আশ্বিন

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ* / রাজনীতি[৪], কমলাকান্তের দপ্তর* / মনুষ্য ফল, দশমহাবিদ্যা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হিমাচল (কবিতা)—নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য (প্রবন্ধ), ভাষা সমালোচন (প্রবন্ধ), চন্দ্রশেখর*, দুর্গোৎসব (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮০ কার্তিক

কমলাকান্তের দপ্তর* / ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয় ১। হিতবাদ দর্শন ২। উদর দর্শন[৫], বাঙ্গালীর বিষপান (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, গৌড়ীয়

১. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

২. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

৩. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

৪. প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি / নারদবাক্য—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

৫. ইউটিলিটি বা উদরদর্শন।

বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, জৈবনিক (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর*, যাত্রা*, মন এবং সুখ (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, নিশিতে বংশীধ্বনি (কবিতা), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮০ অগ্রহায়ণ

জাতিভেদ*, বেদ প্রচার (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর*, পাখী (কবিতা)—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, কমলাকান্তের দপ্তর* / পতঙ্গ, কে তুমি (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, কালিদাস (প্রবন্ধ)—প্রাণনাথ পণ্ডিত, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নবম সংখ্যা ১২৮০ পৌষ

গগন পর্যটন (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ধনবৃদ্ধি (প্রবন্ধ), মানস বিকাশ[১] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর*, অশ্লীলতা (প্রবন্ধ), গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দশম সংখ্যা ১২৮০ মাঘ

কার্যকারণ সম্বন্ধ (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদাস (প্রবন্ধ), বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ)—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতভূমি[২] (কবিতা), চন্দ্রশেখর*, অনন্ত দুঃখ (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, কমলাকান্তের দপ্তর* / আমার মন, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

একাদশ সংখ্যা ১২৮০ ফাল্গুন

ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, ভারতবর্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা (প্রবন্ধ)—লালমোহন শর্মা, কতকাল মনুষ্য (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর*, কমলাকান্তের দপ্তর* / চন্দ্রালোকে—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১. বিদ্যাপতি ও জয়দেব—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

২. "এই কবিতাটি এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।… বঙ্গদর্শন সম্পাদক।"

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮০ চৈত্র

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, বলরাম দাস (প্রবন্ধ), চন্দ্রশেখর*, স্বর্ণ গোলক (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, জ্ঞানদাসের পদানুসরণ (কবিতা) —রজ, কমলাকান্তের দপ্তর* / বসন্তের কোকিল, পরিমাণ রহস্য (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮১ বৈশাখ

ভাষা সমালোচন (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষীয় আর্য-জাতির আদিম অবস্থা*, শ্রীহর্ষ (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর*, প্রাচীনা এবং নবীনা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ

ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, কমলাকান্তের দপ্তর* / স্ত্রীলোকের রূপ—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর*, চিহ্নিত সুহৃদ (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল[১] (প্রবন্ধ)—শ্রীভজরাম [বঙ্কিমচন্দ্র], শ্রীহর্ষ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, পূর্বরাগ (কবিতা)—রজ, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮১ আষাঢ়

চন্দ্রনাথ (সমালোচনা), বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, কমলাকান্তের দপ্তর* / বিবাহ, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, কমলাবিলাসী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর*, তিন রকম[২] (ত্রিবিধ পত্র)—বঙ্কিমচন্দ্র, পরিমাণ রহস্য*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১. বাঙ্গালা শাসনের কল—বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড। এতৎসহ 'বিবিধ' খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২. প্রাচীনা এবং নবীনার পরিশিষ্টে সংকলিত—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮১ শ্রাবণ

বাঙ্গালির বাহুবল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, চার্বাক দর্শন (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, চন্দ্রশেখর*, জৈনধর্ম (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, পাগলিনী (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮১ ভাদ্র

ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, জৈনধর্ম*, চন্দ্রশেখর*, আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, ঐতিহাসিক ভ্রম (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮১ আশ্বিন

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, বাণভট্ট (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, রজনী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাকান্তের দপ্তর* / বড় বাজার, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮১ কার্তিক

চার্বাক দর্শন*, জাতিভেদ (প্রবন্ধ)—শ্রীয, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, রজনী*, কমলাকান্তের দপ্তর* / আমার দুর্গোৎসব, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮১ অগ্রহায়ণ

ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, জাতিভেদ*, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, রজনী*, ভালবাসার অত্যাচার (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, অধঃপতন সঙ্গীত (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নবম সংখ্যা ১২৮১ পৌষ

কোমৎ দর্শন (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সেকাল আর

একাল[১] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, জাতিভেদ*, কল্পতরু[২] (সমালোচনা) —বঙ্কিমচন্দ্র, রজনী*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দশম সংখ্যা ১২৮১ মাঘ

খাদ্য (প্রবন্ধ), আমার সঙ্গীত (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা)— বঙ্কিমচন্দ্র, কলেজ রি-ইউনিয়ন / ১ খেদ ২ নিন্দা ৩ আশা (কবিতা)— শ্রীকৃষ্ণ, রজনী*, ভারত মহিমা (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বৃত্রসংহার[৩] (সমালোচনা) বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

একাদশ সংখ্যা ১২৮১ ফাল্গুন

কমলাকান্তের দপ্তর* / একটি গীত, জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত[৪] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সমাজ বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বৃত্রসংহার*, খাদ্য*, পূর্বরাগ (কবিতা)—রজ, রজনী*, নানা কথা (ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিভাগ)।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮১ চৈত্র।

ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা*, রজনী*, কৃষ্ণচরিত্র[৫] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, বিষধর (প্রবন্ধ), ভাই ভাই (কবিতা)— বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের দপ্তর* / বিড়াল, মহিষমর্দিনী (কবিতা), সঙ্গীত সমালোচনা (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নানা কথা*।

১. অনুকরণ—বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।
২. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।
৩ 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।
৪. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।
৫. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮২ বৈশাখ

শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের দপ্তর* / মশক—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রজনী*, ঋতুবর্ণন[১] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, মিল ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম[২] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, সুখচর (কবিতা)—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, দেবতত্ত্ব*।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮২ জ্যৈষ্ঠ

বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, বিদ্যাপতি (প্রবন্ধ), নিদ্রিত প্রণয় (রূপক)।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮২ আষাঢ়

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, বংশরক্ষা (প্রবন্ধ), মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ (প্রবন্ধ), শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্লিওপেট্রা (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮২ শ্রাবণ

হরিহর বাবু (রচনা), সাহসাঙ্ক চরিত (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, ক্লিওপেট্রা*, শৈশব সহচরী*, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত*, নাটক পরিচ্ছেদ (প্রবন্ধ), বাঙ্গালার পূর্বকথা (প্রবন্ধ), দরিদ্র যুবক (কবিতা)—ভুবনমোহিনী দাসী।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮২ ভাদ্র

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত (প্রবন্ধ)—লালমোহন শর্মা, উত্তর (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, আদিম মনুষ্য (প্রবন্ধ), কুঞ্জবনে কমলিনী (কবিতা), রজনী*, শিবজি (প্রবন্ধ), শৈশব সহচরী*, পদ্য (সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত কবিতা), দ্রৌপদী (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮২ আশ্বিন

চৈতন্য (প্রবন্ধ)—শ্রীকৃষ্ণ দাস, ভাবী বসুমতী (প্রবন্ধ), সূর্যমণ্ডল[১]

১. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

২. ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে—বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড।

(প্রবন্ধ), আত্মাভিমান (প্রবন্ধ), শ্মশানে ভ্রমণ (রচনা)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ভারতভূমির অভ্যর্থনা (কবিতা)—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্য (প্রবন্ধ), শৈশব সহচরী*, রজনী*।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮২ কার্তিক

রজনী*, লজ্জা কেন করি (প্রবন্ধ), বনস্থলীর প্রতি মিস্ ইডেনের উক্তি (কবিতা), সাম্য / স্ত্রীজাতি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কোন 'স্পেশিয়ালের' পত্র (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, উড়িষ্যার পথে প্রভাত (কবিতা), পলাশির যুদ্ধ[১] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, রাধারাণী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮২ অগ্রহায়ণ

রাধারাণী*, চৈতন্য*, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, রজনী*, শৈশব সহচরী*, সুহৃৎ সঙ্গম (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ষ সমালোচন (আলোচনা)।

নবম সংখ্যা ১২৮২ পৌষ

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীনীঃ, বাঙ্গালি কবি কেন? (প্রবন্ধ), চৈতন্য*, নীতিকুসুমাঞ্জলি (কবিতা)—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, শৈশব সহচরী*।

দশম সংখ্যা ১২৮২ মাঘ

পালি ভাষা ও তৎসমালোচন (প্রবন্ধ)— রামদাস সেন, নীতিকুসুমাঞ্জলি*, জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, কৃষ্ণকান্তের উইল*, চৈতন্য*, ধাত্রী-শিক্ষা (সমালোচনা), কালিদাসের উপমা (প্রবন্ধ), ভারত মহিলা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

একাদশ সংখ্যা ১২৮২ ফাল্গুন

ভারত মহিলা*, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, প্রেমনিমজ্জন (কবিতা)—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, নীতিকুসুমাঞ্জলি*, চৈতন্য*, কৃষ্ণকান্তের উইল*, বেদ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, কালিদাসের উপমা*।

১. 'বিবিধ' খণ্ডে সংগৃহীত।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮২ চৈত্র

বেদ*, গঙ্গাস্তব (কবিতা), ভারত মহিলা*, নীতিকুসুমাঞ্জলি*, বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ—বঙ্কিমচন্দ্র।

[১২৮৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।]

প ঞ্চ ম ব র্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮৪ বৈশাখ

বঙ্গদর্শন (ভূমিকা)—বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকান্তের উইল*, রাষ্ট্রবিপ্লব (প্রবন্ধ), জৈনমত সমালোচন (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, বুড়া বয়সের কথা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কেন ভালবাসি (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, আমাদের গৌরবের দুই সময় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শৈশব সহচরী*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮৪ জ্যৈষ্ঠ

ভারতে একতা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, স্বপ্ন উন্মত্ততা (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকান্তের উইল*, আমাদের গৌরবের দুই সময়*, শৈশব সহচরী*, বাহুবল ও বাক্যবল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, খদ্যোত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮৪ আষাঢ়

সতীদাহ (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বেদবিভাগ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, ভুলো না ও কুহুস্বর ভুলো না আমায় (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সভ্যতা (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বোম্বাই ও বাঙ্গালা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল*, আমার মালা গাঁথা (রচনা)—কৃ।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮৪ শ্রাবণ

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. বঙ্গে ধর্মভাব (প্রবন্ধ)—

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শাস্তি ও সাহসশিক্ষা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল*, শৈশব সহচরী*, বাঙ্গালার সাহিত্য (সমালোচনা)।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৪ ভাদ্র

সর্পবিষ চিকিৎসা (সমালোচনা), বোম্বাই ও বাঙ্গালা*, কৃষ্ণকান্তের উইল*, বঙ্গে উন্নতি (প্রবন্ধ), শৈশব সহচরী*, বাহুবল ও বাক্যবল*।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮৪ আশ্বিন

শঙ্করাচার্য কি ছিলেন ? (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শৈশব সহচরী*, নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ (সমালোচনা), পাঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায় (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তর্কসংগ্রহ (প্রবন্ধ), কৃষ্ণকান্তের উইল*, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা[১] (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮৪ কার্তিক

কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব (প্রবন্ধ), সতীদাহ / প্রতিবাদ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আর্যগণের আচার ব্যবহার (প্রবন্ধ) —রামদাস সেন, কৃষ্ণকান্তের উইল*, ডাহির সেনাপতি নাটক (সমালোচনা)।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮৪ অগ্রহায়ণ

বৈজ্ঞিকতত্ত্ব[২] (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈশব সহচরী*, তর্ক সংগ্রহ*, কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব*, কৃষ্ণকান্তের উইল*।

নবম সংখ্যা ১২৮৪ পৌষ

কমলাকান্তের পত্র (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের

১. মনুষ্যত্ব কি—বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড।

২. অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। 'সঞ্জীবনী সুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, "তিনি [সঞ্জীবচন্দ্র] নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 'জালপ্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।"

সমালোচনা*, কৃষ্ণকান্তের উইল*, বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৈজ্ঞিকতত্ত্ব*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দশম সংখ্যা ১২৮৪ মাঘ

মানব ও যৌন নির্বাচন (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, মণিপুরের বিবরণ (প্রবন্ধ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বৃত্রসংহার (সমালোচনা), ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা (প্রবন্ধ), তর্কতত্ত্ব (সমালোচনা), কৃষ্ণকান্তের উইল*, শৈশব সহচরী*।

একাদশ সংখ্যা ১২৮৪ ফাল্গুন

জটাধারীর রোজনাম্‌চা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়*, শঙ্করাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী (প্রবন্ধ), শৈশব সহচরী*, কমলাকান্তের পত্র* / পলিটিক্স, বৃত্রসংহার*, কালবৃক্ষ (কবিতা)—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮৪ চৈত্র

সংযুক্তা (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, তর্কসংগ্রহ*, বৈজ্ঞিকতত্ত্ব*, রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র।

ষষ্ঠ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮৫ বৈশাখ

রাজসিংহ*, আকবর সাহের খোষরোজ (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, বৈজ্ঞিক-তত্ত্ব*, জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, কালিদাস ও সেক্ষপীয়র (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তর্কসংগ্রহ*, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ

রাজসিংহ*, তর্কসংগ্রহ*, জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, কুন্দনন্দিনী (সমালোচনা)—পূর্ণচন্দ্র বসু, বাঙ্গালা ভাষা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, রাগ নির্ণয় (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮৫ আষাঢ়

রাজসিংহ*, তর্কসংগ্রহ*, নানক (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত, জটাধারীর

রোজনাম্চা*, সমাজের পরিবর্ত কয়রূপ (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাগ নির্ণয়*, বন্ধুতা (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন, একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮৫ শ্রাবণ

রাজসিংহ*, তর্কসংগ্রহ*, বৈজিকতত্ত্ব*, জটাধারীর রোজনাম্চা*, প্রাচীন ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কমলাকান্তের পত্র* / বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৫ ভাদ্র

জটাধারীর রোজনাম্চা*, দুর্গোৎসব (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালির বীরত্ব (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত, রাগ নির্ণয়*, জুরীর বিচার (প্রবন্ধ), রাজসিংহ*।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮৫ আশ্বিন

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জটাধারীর রোজনাম্চা*, মণিপুরের বিবরণ (প্রবন্ধ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ভার্গববিজয় (সমালোচনা)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইয়াং বাঙ্গালীর সামাজিক বুদ্ধি (প্রবন্ধ), উৎকলের প্রকৃতাবস্থা (প্রবন্ধ)—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮৫ কার্তিক

সমাজ সংস্কার (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, উৎকলের প্রকৃতাবস্থা*, জটাধারীর রোজনাম্চা*, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির ফল (প্রবন্ধ), মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮৫ অগ্রহায়ণ

রত্নরহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, উৎকলের প্রকৃতাবস্থা*, জটাধারীর রোজনাম্চা*, অশনি (কবিতা)—মনোরঞ্জন গুহ, মাধবীলতা*, চিত্ত মুকুর (সমালোচনা), লোকশিক্ষা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নবম সংখ্যা ১২৮৫ পৌষ

মন্দর পর্বত (প্রবন্ধ), রত্নরহস্য*, বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তবু বুঝিল না মন (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার (প্রবন্ধ), জটাধারীর রোজনাম্‌চা*।

দশম সংখ্যা ১২৮৫ মাঘ

গুরুগোবিন্দ (প্রবন্ধ), জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার*, মনুষ্যজাতির উন্নতি (প্রবন্ধ), মাধবীলতা*, জেন্দ অবস্থা (প্রবন্ধ)।

একাদশ সংখ্যা ১২৮৫ ফাল্গুন

বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার*, অশোক (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রত্যাখ্যান (কবিতা), মাধবীলতা*, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮৫ চৈত্র

জটাধারীর রোজনাম্‌চা*, একস্‌চেঞ্জ্‌ (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তৈল (রচনা)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রের বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ), বিবেক ও নৈরাশ (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গোন্নয়ন*, পদোন্নতির পন্থা (প্রবন্ধ)।

[১২৮৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।]

সপ্তম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮৭ বৈশাখ

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম (প্রবন্ধ), সমাজ সংগঠনতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—র. স., নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নৈষধ সমালোচক (প্রবন্ধ)।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গোন্নয়ন*, তর্কপ্রণালী (প্রবন্ধ), খাজনা কেন দিই (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অভিজ্ঞান শকুন্তল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, এত কাঁদি তবু কেন না

জুড়ায় প্রাণ রে (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়বার বিবাহ (প্রবন্ধ), প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮৭ আষাঢ়

বঙ্গীয় শঙ্করাচার্যের নালিশ (প্রবন্ধ)—শঙ্করাচার্য বঙ্গদেশী, স্মৃতি কিংবা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন (কবিতা), বঙ্গ বৈজ্ঞানিক (প্রবন্ধ)—শ্রীয. গো., অভিজ্ঞান শকুন্তল*, শিক্ষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাঙ্গালার জ্বর (সমালোচনা), মাধবীলতা*।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮৭ শ্রাবণ

মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মৎসদেশ (প্রবন্ধ)—হৃ. কে. ভ., শঙ্করাচার্যের তিরস্কার (প্রবন্ধ)—শঙ্করাচার্য বঙ্গদেশী, ভূতের জাতি (প্রবন্ধ), মাধবীলতা*, উপাসনাবিষয়ক তুলনা (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, হৃদয়-উদাস (রচনা)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৭ ভাদ্র

অভিজ্ঞান শকুন্তল*, কালেজি শিক্ষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শশধর (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবীলতা*, মালাচন্দন (প্রবন্ধ)।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮৭ আশ্বিন

মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, অভিজ্ঞান শকুন্তল*, রত্নতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর (সমালোচনা)।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮৭ কার্তিক

নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউর মত (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অভিজ্ঞান শকুন্তল*, চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (প্রবন্ধ)—র. স., মাধবীলতা*।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮৭ অগ্রহায়ণ

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি (প্রবন্ধ)—পূর্ণচন্দ্র বসু, মাধবীলতা*, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ভট্টাচার্য বিদায় প্রণালী (প্রবন্ধ), ঢাকা ও পূর্ববাঙ্গালা (প্রবন্ধ)।

নবম সংখ্যা ১২৮৭ পৌষ

বঙ্গোন্নয়ন*, চাকুরীর পরীক্ষা (প্রবন্ধ), অভিজ্ঞান শকুন্তল*, পালামৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, বাল্মীকির জয় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যার কাজ সেই করুক (প্রবন্ধ)।

দশম সংখ্যা ১২৮৭ মাঘ

বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত (প্রবন্ধ), রত্নরহস্য*, মাধবীলতা*, বাল্মীকির জয়*, বাঙ্গালীর উৎপত্তি*, জল (প্রবন্ধ)।

একাদশ সংখ্যা ১২৮৭ ফাল্গুন

বাঙ্গালীর উৎপত্তি*, বাঙ্গালার সাহিত্য (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পালামৌ*, মাধবীলতা*।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮৭ চৈত্র

বাঙ্গালীর উৎপত্তি*, আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, গৃহসন্ন্যাস (প্রবন্ধ), বাল্মীকির জয়*, আমার পরাণ (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অ ষ্ট ম ব র্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮৮ বৈশাখ

আনন্দমঠ*, বাঙ্গালীর উৎপত্তি*, অলঙ্কারশাস্ত্র (প্রবন্ধ), মাধবীলতা*, যোগেশ (সমালোচনা)।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ

আনন্দমঠ*, বাঙ্গালীর উৎপত্তি*, বঙ্গোন্নয়ন*, নূতন কথা গড়া (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (সমালোচনা)—পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রলয়ের জলোদ্ভাবন (প্রবন্ধ), কল্পনা (মাসিক পত্রিকা সমালোচনা)।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮৮ আষাঢ়

অভিজ্ঞান শকুন্তল*, আনন্দমঠ*, ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি (কবিতা), সাবেক

'মনুষ্যত্ব' ও হালের 'সাইন করা' (প্রবন্ধ), রত্নরহস্য*, পালামৌ*, বাঙ্গালায় কলের কাপড় (প্রবন্ধ)।

চতুর্থ সংখ্যা ১২৮৮ শ্রাবণ

আনন্দমঠ*, রঙ্গমতী কাব্য (সমালোচনা), পালামৌ*, রস (প্রবন্ধ), বাঙ্গালা ভাষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রত্নরহস্য*।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৮ ভাদ্র

বহুপতিত্ব (প্রবন্ধ), ফুলের ভাষা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅঃ, আনন্দমঠ*, বঙ্গদেশের পরাধীনতা (প্রবন্ধ), আহার Versus বিবাহ[১] (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের জবানবন্দী (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষিতত্ত্ব (মাসিক পত্রিকা সমালোচনা)।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮৮ আশ্বিন

আনন্দমঠ*, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (সমালোচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ফুলের ভাষা*, বাল্মীকির জয়*, স্বভাবে কি অর্থ নাই (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পালামৌ*, যোগবল (প্রবন্ধ)।

[১২৮৮ বঙ্গাব্দের সপ্তম থেকে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।]

নবম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা ১২৮৯ বৈশাখ

রত্নরহস্য*, আনন্দমঠ*, কোজাগর পূর্ণিমা[২] (কবিতা), অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য (প্রবন্ধ)—শ্রীযো, ফুলের ভাষা*, ঢেঁকি (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য*, আনন্দমঠ*, একটি প্রিয় জলাশয় (কবিতা)—

১. রামধন পোদ—বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড।

২. "এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের লেখা।"—সম্পাদক।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, বহুপত্নীত্ব (প্রবন্ধ), প্রকৃতি (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

তৃতীয় সংখ্যা ১২৮৯ আষাঢ়

বাঙ্গালীদিগের পৌরুষ (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান (প্রাচীন কবিতা), অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য*, মহারাজ নন্দকুমার (প্রবন্ধ), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সেইদিন (কবিতা)—মোহিনীমোহন দত্ত, সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চতুর্থসংখ্যা ১২৮৯ শ্রাবণ

কাঞ্চনমালা*, জালপ্রতাপচাঁদ (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অদৃষ্ট (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন।

পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৯ ভাদ্র

কাঞ্চনমালা*, অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য*, কোকিল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, জালপ্রতাপচাঁদ*।

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮৯ আশ্বিন

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় (প্রবন্ধ), কাঞ্চনমালা*, জালপ্রতাপচাঁদ*।

সপ্তম সংখ্যা ১২৮৯ কার্তিক

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য*, কাঞ্চনমালা*, কাকাতুয়া (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, জালপ্রতাপচাঁদ*, বঙ্গে বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)।

অষ্টম সংখ্যা ১২৮৯ অগ্রহায়ণ

রজনীর মৃত্যু (কবিতা)—অক্ষয়কুমার বড়াল, অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য*, রত্নরহস্য*, জগৎশেঠ (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত, কাঞ্চনমালা*, ইহলোক ও পরলোক (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, মেঘদূত (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নবম সংখ্যা ১২৮৯ পৌষ

জীয়ন্ত মানুষের ভূত (প্রবন্ধ), কাঞ্চনমালা*, জীবন ও পরলোক

(প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, রাজা সিতাব রায় (প্রবন্ধ), মেঘদূত*, পঞ্চভূত (প্রবন্ধ), দেবী চৌধুরাণী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র।

দশম সংখ্যা ১২৮৯ মাঘ

দেবী চৌধুরাণী*, কাঞ্চনমালা*, হিন্দু পত্নী (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, হনুমদ্বাবু সংবাদ (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

একাদশ সংখ্যা ১২৮৯ ফাল্গুন

দেবী চৌধুরাণী*, কোথা রাখি প্রাণ (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘদূত*, Bransonism (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, যাত্রার ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ), পালামৌ*, পরলোক কোথায় (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দ্বাদশ সংখ্যা ১২৮৯ চৈত্র

রত্নালঙ্কার (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, দেবী চৌধুরাণী*, সিরাজউদ্দৌলা (প্রবন্ধ), বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ), সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সোমপ্রকাশে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার সমালোচনা

বিংশতি বৎসর পূর্বে বঙ্গভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইদানীন্তন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হইতে হয়। পূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যরচনা প্রণালীর পারিপাট্য ও চাতুর্য কিছুমাত্র ছিল না। যে সমস্ত গুণসদ্ভাব নিবন্ধন ভাষা পরিষ্কৃত হইয়া সামাজিক গুণের সন্তুষ্টি সম্পাদনের হেতুভূত হয়, বঙ্গভাষায় তৎসমুদায়ের নিতান্ত অভাব ছিল। আমাদিগের এইরূপ কথায় কেহ যেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের রচনাপ্রণালীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া এটি নিরবচ্ছিন্ন বাতুল প্রলাপবৎ নিরর্থক ও অযুক্তিসম্পন্ন বিবেচনা না করেন। আমরা পদ্য রচনাপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতেছি না; সামাজিক জনহৃদয়গ্রাহিণী গদ্য রচনাই আমাদিগের লক্ষ্যস্থল। ভারতচন্দ্রের চিত্তবিমোহিনী বর্ণনা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি পদ্য রচনা বিষয়ে যেরূপ কুহকিনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গদ্য রচনায় তাহার কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। তৎপ্রণীত চণ্ডী নাটক আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া দিবে। ভারতচন্দ্র এই নাটক সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় রচনালালিত্য কোনও অংশে প্রদর্শিত হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রিকা ও পুরুষপরীক্ষা অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল। এই দুই গ্রন্থের রচনা যেরূপ নীরস বর্ণনা তদ্রূপ জুগুপ্সিত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণালীর সহিত আধুনিক রচনাপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষা সমূহ পরিবর্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ পূর্বাপেক্ষা বঙ্গভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ দিন দিন নূতন নূতন পুস্তক হস্তে করিয়া বঙ্গীয় সমাজে উপনীত হইতেছেন। অনেকে ইংরাজীকে আদর্শ করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ও সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে শীর্ষলিখিত যে পত্রিকাখানির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাও উৎকৃষ্টতর ইংরাজী পত্রিকাসমূহের আদর্শানুসারে লিখিত।

যে সমুদয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শন সম্পাদনকার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গসমাজে

অপ্রসিদ্ধ নহেন। ইঁহাদিগের অনেকেই লেখনীর বলে সহৃদয়গণের নিকট বিপুল প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সমবেত-চেষ্ট হইয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইয়াছেন, এটি নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শন সুলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের রসময়ী লেখনীবিনির্গত হইবে বলিয়া অনেকেই সোৎসুকচিত্তে ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিবসে সেই অভীষ্ট বঙ্গদর্শন কুতূহলপর পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত হইল। সকলেই উৎফুল্লনয়ন হইয়া আগ্রহ-সহকারে বঙ্গদর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সেই আগ্রহের বশবর্তী হইয়া বঙ্গদর্শনখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমাদিগের মন আশানুরূপ পরিতৃপ্ত হইল না। বঙ্গদর্শনে অতৃপ্তির অনেকগুলি কারণ লক্ষিত হইল। এই কারণগুলি তিরোহিত না হইলে বঙ্গদর্শন কোনও কালে সহৃদয় সমাজে আদরণীয় হইতে পারিবে না। এতন্নিবন্ধন অদ্য আমরা বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদর্শন রয়েল আটপেজী ফর্মার ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাগুলি সচরাচর যেরূপ আকারের হইয়া থাকে, বঙ্গদর্শন তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে বৃহৎ হইয়াছে বটে; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী পত্রিকাসমূহের অনুরূপ হয় নাই। এ অংশে বঙ্গদর্শনের অবয়ব আরও পরিবর্ধিত করা উচিত ছিল।

বঙ্গদর্শনের প্রস্তাবিত সংখ্যায় পত্রসূচনা, ভারতকলঙ্ক, কামিনীকুসুম, বিষবৃক্ষ, আমরা বড়লোক, সঙ্গীত, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল এবং উদ্দীপনা এই আটটি বিষয় বর্ণিত আছে। লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে অনেকগুলি পত্রিকানুরূপ হয় নাই। পত্রসূচনাটি অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালিগণের বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠে অনাস্থা, তাহার কারণ, বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি পত্রসূচনাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভারত কলঙ্কে হিন্দুজাতির বীরত্ব, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, অনাস্থা, অনৈক্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রস্তাবে লেখক যে সমস্ত স্বমতপরিপোষক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় যুক্তিবহির্ভূত হয় নাই। আমরা অনেকাংশে ইহার অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু লেখক মীবারবাসিগণ ভিন্ন আর সমুদয় হিন্দুকেই যে স্বাধীনতায় অনাস্থাবান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এটি আমরা কোনও

প্রকারে স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক গুণগান আছে।

কামিনীকুসুম পদ্যময়। সচরাচর বাঙ্গালা পত্রিকাতে যে সমস্ত পদ্য দৃষ্ট হয়, কামিনীকুসুম তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। বিষবৃক্ষ একটা ধারাবাহিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি লিখিতেছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রস্তাবিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহার উপন্যাস সকলেই আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইল, বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। যে উপন্যাস পাঠে পাঠকের কৌতুহল উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই যথোচিতরূপে উপাখ্যান গ্রন্থনের চাতুর্য আছে, এটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপনের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষবৃক্ষে এই কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই সমাপ্তি ফল নির্দেশ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সূচনাতেই আখ্যায়িকার সমুদয় ফল খুলিয়া বলিলে পাঠকের পাঠেচ্ছা বলবতী হওয়া সম্ভাবিত নহে। আদৌ উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্তব্য; পরিশেষে যখন প্রারম্ভনিহিত বীজ ফলোনোন্মুখ হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ফল নির্দেশ কারিয়া আখ্যায়িকার উপসংহার করা বিধেয়। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক এই চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর করা বিধেয়? এরূপ করিলে কি বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায় না? বিষবৃক্ষের এইরূপ গল্পবন্ধপ্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এ দোষ মার্জনীয় নহে।

'আমরা বড়লোক' প্রস্তাবে বঙ্গদেশীয় পরিচ্ছদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। লেখক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের একেবারে অনমুমোদনীয় নহে। কিন্তু তিনি যেরূপ রসিকতা ও বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়াছে। রসিকতা প্রদর্শন সময়েও

ধীরতা ও গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। অধৈর্যবিলসিত রসিকতা অসামাজিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা দুঃখিত হইলাম, বঙ্গদর্শন এইরূপ অসামাজিকতা দোষে দূষিত হইয়াছে। সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই। সচরাচর সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, এ প্রস্তাবটিও তাহাদিগের অন্যতম সহোদর। ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল ও উদ্দীপনা প্রস্তাব দুটা মন্দ হয় নাই। লেখক ভারতবর্ষীয়গণের উদ্দীপনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে যথার্থ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণ যে একেবারে উদ্দীপনাবিরহিত ছিলেন, এটি আমরা কোনও মতে স্বীকার করিতে পারিলাম না। যাঁহারা আর্যজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে পূর্বতন আর্যগণ বক্তৃতাশক্তি (এলোকোয়েন্স)-শূন্য ছিলেন না।

বঙ্গদর্শন যে যে বিষয়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা একে একে নির্দেশ করিলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি লিখিত বিষয়সমূহের অনেকগুলি বঙ্গদর্শনের অনুরূপ হয় নাই। 'আমরা বড়লোক', 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' প্রভৃতি বিষয় বঙ্গদর্শনে শোভা পায় না। এরূপ সামান্য বিষয় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালা পত্রিকাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক রহস্য, গবেষণাসম্বলিত ইতিহাস, আর্যগণের প্রকৃত পুরাবৃত্ত, লোকবিশ্রুত দেশীয় ব্যক্তিগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ই বঙ্গদর্শনের অনুরূপ। এইরূপ বিষয় লিপিবদ্ধ হইলে বঙ্গদর্শন সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। অন্যথা বঙ্গদর্শন সাধারণ বাঙ্গালা পত্রিকা অপেক্ষা উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনের ভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গদর্শনের ভাষা সাধারণতঃ অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহাতে অনেকগুলি হৃদয়ভেদী দোষ দৃষ্ট হইল। বঙ্গদর্শনের স্থানে স্থানে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। 'বিবরিত' প্রভৃতি কতকগুলি ঞ্যন্ত ক্রিয়ার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এই ঞ্যন্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেও শ্রুতিমধুর হয় না। বিবরিত স্থলে 'বিবৃত' প্রয়োগ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। 'সাবধানী' 'একেবারে' 'কেবলমাত্র' পদগুলি দুষ্ট। এইগুলির পরিবর্তে 'সাবধান' 'একবারে' 'কেবল' অথবা 'মাত্র' প্রয়োগ করা বিধেয়। 'কেবলমাত্র' এই দুটি কথা একবারে প্রয়োগ করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। 'আমরা

বড়লোক' প্রস্তাবে লেখক 'সাবধানী' পদটি কি প্রকারে সিদ্ধ করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ চাঞ্চল্য, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রদর্শন নিরতিশয় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। বিষ-বৃক্ষ আখ্যায়িকার স্থলে 'গুরু সাহেবী' বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে, ঠেঙ্গান হইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি একস্থলে এরূপ অনুচিতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে পাঠ করিলে আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারা যায় না। এই আখ্যায়িকার লেখক অনেক স্থলে ব্যাকরণ ও ভাষার মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, মুদ্রিত নয়নে তাহাই লিখিয়াছেন। 'সরলতা চমৎকারা' কিরূপ বাঙ্গালা তাহা আমরা বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দশম বর্ষীয় বালকও এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। লেখক ব্যাকরণ-বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই মুণ্ড নিপাত করিয়াছেন। 'পদ্মপলাশ নয়নী' কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে? এইরূপ গৃহপুষ্ট ব্যাকরণের আঘাতে ক্ষীণাঙ্গী বাঙ্গালা ভাষাকে প্রহার করিলে আর রক্ষা নাই। 'পদ্মপলাশ নয়না'-ই বিশুদ্ধ পদ 'ন দ্ব্যধিকস্বরান্নাসিকোদরবর্জ্জাৎ' সূত্র ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। মুগ্ধবোধ টীকাকার দুর্গাদাসও ইহার পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক এই মতকে পদদলিত করিয়া বিলক্ষণরূপে স্বীয় স্ত্রীত্যবিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'শ্যামাঙ্গিনী' পদটিও দুষ্ট। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে, এই পদটি সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালা কি সংস্কৃতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'শ্যামাঙ্গিনী' স্থলে শ্যামাঙ্গী লিখাই সঙ্গত। কাব্যনির্ণয়কার 'চ্যুতসংস্কৃতি' দোষের উদাহরণ স্থলে 'শ্যামাঙ্গিনী' পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে 'শ্যামাঙ্গিনী' বিশুদ্ধ তাহা নহে।

বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে উদাত্ত ও সমাসবহুল পদের সহিত সাধারণ ব্যবহার্য শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভঙ্গপ্রক্রমতা নিতান্ত দোষাবহ। আমরা উদাহরণস্থলে 'মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ' বাক্যটা ব্যবহার করিলাম। 'মসীনিন্দিত' পদের সহিত 'গা' শব্দটা প্রযুক্ত হওয়াতে ভাষার কিরূপ লালিত্য বর্ধিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। 'তিনি খাওয়া দাওয়া করিয়া দুগ্ধফেননিভ পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইজন অসূর্য্যম্পশ্যা

কামিনী কুলিশপাতোপমরবে ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।' এইরূপ বাঙ্গালা কর্ণে যেরূপ অমৃতবর্ষণ করিয়া থাকে 'মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ'-ও সেইরূপ অমৃতবর্ষণ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা সুলেখক বলিয়া গণ্য, লোকে যাহাদিগের রচনার অনুকরণে ব্যগ্র, তাঁহাদিগের এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা কি বিধেয়? ইহাতে কি গাত্রে উষ্ণবারি নিক্ষিপ্ত হয় না? বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সুলেখক বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় এক বঙ্গদর্শনের প্রান্তরে তাঁহাদিগের সেই কীর্তি মলিন হইল।

বঙ্গদর্শনে অস্পষ্টতা প্রভৃতি দোষও বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল। 'ভারত কলঙ্ক' প্রস্তাবের 'ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহা দুর্জ্ঞেয়ও নহে।' 'আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ।' 'নিঃশেষ বিজিত হয়।' প্রভৃতি কিরূপ বিশদ বাঙ্গালা তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, এইরূপ অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইলে ভাষার অণুমাত্র উন্নতি হইবে না। যিনি মনের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। উল্লিখিত তিনটি বাক্যের এইরূপ পরিবর্তন হইলে ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশদ হইত। যথা—'ভারতবর্ষীয়গণের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণ দুর্জ্ঞেয় নহে।' 'আরব্যদিগের ন্যায় গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও বিফলযত্ন হইয়াছিল।' 'সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।' ভাষার এইরূপ অস্পষ্টতা বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। বঙ্গদর্শনের স্থলবিশেষে ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য দোষের মধ্যে পরিগণিত। 'ফেসিয়ন ও পবলিক ডিনারে'র কি বাঙ্গালা শব্দ নাই? নাটক কিম্বা প্রহসনে যদি কোন ইংরাজীপ্রিয় সৌখীন পুরুষের মুখ হইতে এই কথাগুলি নির্গত হইত, তাহা হইলে এটি দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যেরূপভাবে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য তাহা দোষ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যে ইংরেজী শব্দগুলির বাঙ্গালা হয় নাই অথচ ঐ ইংরেজী শব্দগুলিই সর্বদা চলিত বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইলে ভাষার তাদৃশ ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহার বাঙ্গালা আছে, তথাবিধ ইংরেজী শব্দ

ব্যবহার করা কোনও প্রকারে সঙ্গত নহে। যাঁহারা এইরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বড়লোকের লিখিত বলিয়া কেহ যেন এইরূপ ভাষার অনুকরণ না করেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা রচনা বিষয়ে যেরূপ চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য দোষ বলিয়া গণনা করা উচিত। রচনাগত দোষ সংশোধন করা লেখকগণের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় তাঁহারা ভবিষ্যতে সুলেখক পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।

উপসংহার সময়ে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, কেহ যেন আমাদিগকে লেখকগণের বিদ্বেষ্টা বিবেচনা না করেন। আমরা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই নাই। অমনোযোগিতা নিবন্ধনই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, বঙ্গদর্শনের লেখকগণ রচনা বিষয়ে নিতান্ত অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া লিখুন, বঙ্গদর্শন আদরণীয় হইবে, তাঁহাদিগের কীর্তিও উজ্জ্বলভাব ধারণ করিবে। বঙ্গদর্শনে বর্ণবিন্যাসঘটিত দোষ (স্পৃহনীয় প্রভৃতি) দৃষ্ট হইল। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

[সোমপ্রকাশ ১১ বৈশাখ ১২৭৯, ২৩ সংখ্যা]

বঙ্গদর্শনের নিয়মাবলী

		মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
অগ্রিম	বার্ষিক	৩৲	।৶০	৩।৶০
পশ্চাদ্দেয়	বার্ষিক	৪॥০	।৶০	৪৸৶

১। ডাকের টিকিট পাঠাইলে স্বতন্ত্র ⁄০ এক আনা কমিস্যন টাকা প্রতি দিতে হইবে। ডাকের টিকিট অর্ধ আনা মূল্যের অধিক পাঠাইবার আবশ্যক নাই।

২। যাঁহারা মণিঅর্ডর পাঠাইবেন, তাঁহারা হুগলির কালেক্টরীতে আমার নামে পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন না।

৩। বেয়ারিং বা ইনসফিসেণ্ট পত্রাদি আমরা লইব না।

৪। আমরা পূর্বমত আর মূল্যপ্রাপ্তি বঙ্গদর্শনে স্বীকার করি না, মূল্য পাইলেই গ্রাহকদিগের নিকট স্বতন্ত্র রসিদ পাঠাই। যদি রসিদ দুই সপ্তাহের মধ্যে না পৌছে, তবে বুঝিতে হইবে যে মূল্য আমাদের হস্তগত হয় নাই।

৫। বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দিবার খরচা নিম্নলিখিত মত লওয়া যাইবে।

প্রতি পংক্তি	...	৶০
প্রতি কলম	...	৩॥০
প্রতি পৃষ্ঠা	...	৬৲
আট পেজ	...	৪৫৲

তিনবারের অধিক হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

বঙ্গদর্শন কার্যালয়
কাঁটালপাড়া
নৈহাটী পোষ্ট আপিস

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কার্যাধ্যক্ষ।
[১২৮৪ অগ্রহায়ণ]

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

ভ্রমর

ভ্রমর নামে একখানি অভিনব মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন কার্যালয় হইতে বৈশাখ অবধি প্রকাশ হইতেছে।

যাহা যাহা সুখপাঠ্য এবং যাহাতে বিশুদ্ধ আমোদ ও সুশিক্ষা একত্রে মিলিত করা যায়, তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। উপন্যাস, পদ্য, কৌতুকাবহ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, দেশীয় সামাজিক কথা, ইত্যাদি বিষয় এই পত্রে লিখিত হইবে। যাহাতে কৃতবিদ্য এবং অল্পজ্ঞান উভয় শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন হয় এমত যত্ন করা যাইবে।

ইহার মূল্য অতি অল্প। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা ও ডাকমাশুল ।৵০ মোট ১॥৵০। পশ্চাদ্দেয় মূল্য ১॥৵০ ডাকমাশুল ।৵০ মোট ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ মাত্র।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের গ্রাহক তাঁহারা ৫৲ টাকার একখানি নোট পাঠাইলে দুই পত্রই পাইতে পারিবেন।

ভ্রমরের আকার ১২ পেজি রয়েল ২৪ পৃষ্ঠা। ইহা প্রতি মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশ হয়। গ্রাহকগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম ও মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / বঙ্গদর্শন কার্যাধ্যক্ষ

[১২৮১ জ্যৈষ্ঠ]

বিজ্ঞাপন

বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে কেহ আমাকে পত্র লিখিবেন না। আমি বঙ্গদর্শন সম্পাদক নহি। এরূপ পত্রের আমি কোন উত্তর দিই না।

আমার পুস্তকাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমার নিজ কার্যকারক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বঙ্গদর্শন কার্যাধ্যক্ষকে লিখিবেন। আমাকে লিখিলে উত্তর পাইবেন না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৮৪ বৈশাখ]

ভারতী।

আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী নামে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়িনী একখানি মাসিক সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এখনকার সুপ্রসিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার সাহায্য করিবেন। ইহার কলেবর রয়েল ৮ পেজি ফর্মা। মূল্য বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা। বিদেশে বার্ষিক ।৵০ ছয় আনা ডাকমাশুল লাগিবে। ইহা প্রতিমাসের ১৫ই প্রকাশ হইবে। যাঁহারা ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহারা যোড়াসাঁকো দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন ৬নং বাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / সম্পাদক

[১২৮৪ শ্রাবণ]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রতি মাসের প্রথম দিবসে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি নাই। মাসের যে কোন দিবসে হউক বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবে; কিন্তু পূজা উপলক্ষে আমাদিগের আপিস বন্ধ থাকায় এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদর্শন-কার্যকারগণ পীড়িত হওয়ায় এইবার বঙ্গদর্শন কিছু বিলম্বে বাহির হইল।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / বঙ্গদর্শন কার্যাধ্যক্ষ

[১২৮৪ কার্তিক]

শৈশব সহচরী।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পুনঃ মুদ্রাঙ্কনে এই উপন্যাস অনেকস্থানে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ টাকা ও ডাকমাশুল ৵০ আনা

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে, কলিকাতা ক্যানিঙ লাইব্রেরিতে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

[১২৮৪ ফাল্গুন]

নির্দেশিকা